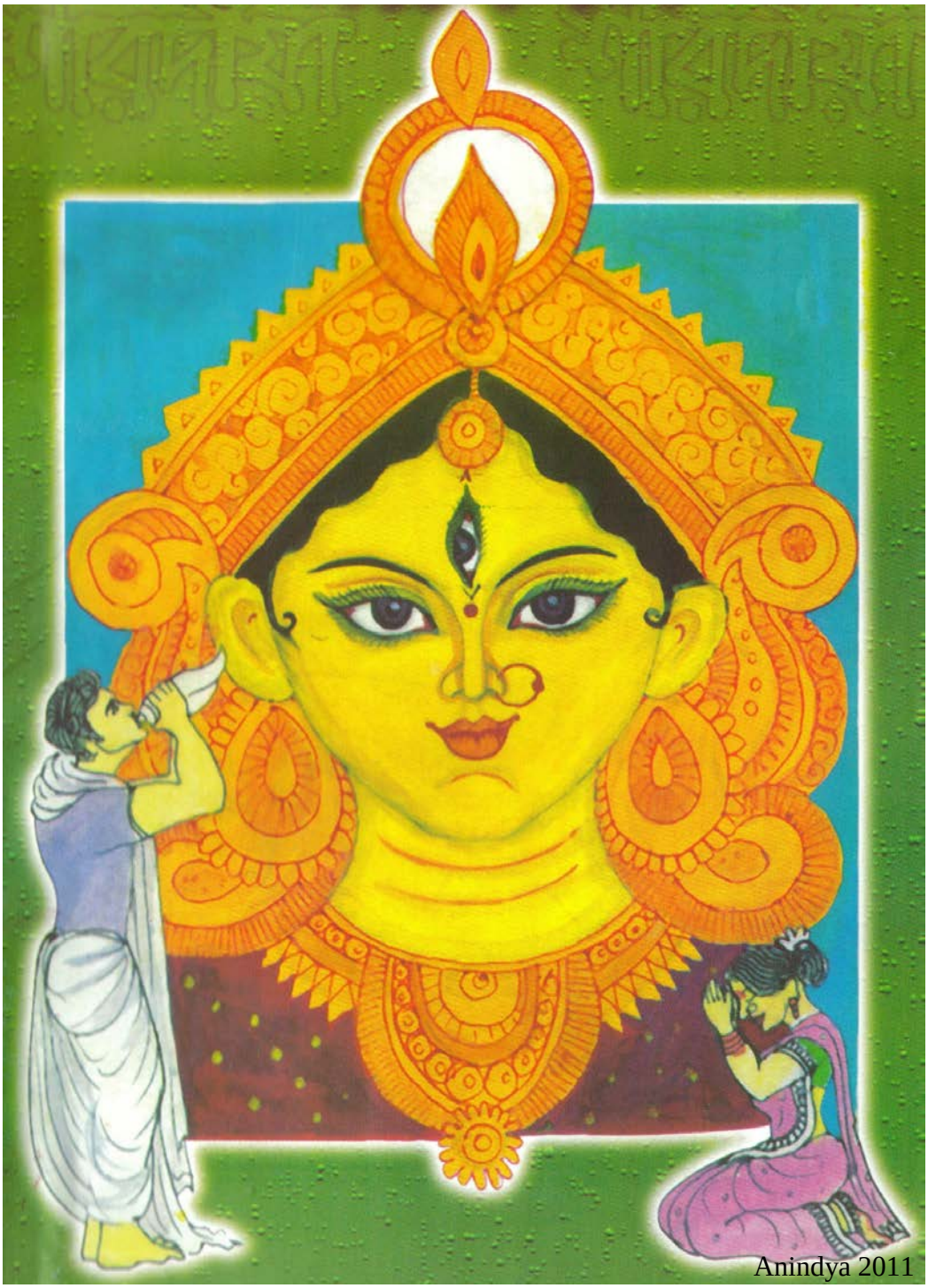

Anindya 2011

অঞ্জলি

Anjali 2012: Durga Puja Magazine

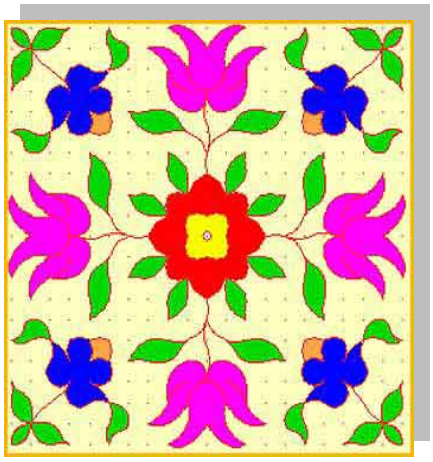

Raaka 2012

Message from the Board

Dear Friends,

There is a nip in the air reminding us the advent of the fall season. Our minds and hearts leap forward to welcome the festive season that is knocking at our door.

The journey that a small community of ours had started in 2008 has now stepped into its 5th successful year. With its foundation getting stronger every year, our volunteers are confident that the 2012 Sharodutsav being held on October the 13th will be another great successful event.

The Greater Binghamton Bengali Association invites you to join the 2012 Durga Puja celebration and share the joy and happiness of this festive time with us. We thank you for your continued participation and generous support.
Warm Sharodiya greetings to all of you and your family,
Sincerely

The 2012 Durga Puja Committee
Greater Binghamton Bengali Association
http://www.binghamtonpuja.org/

Greater Binghamton Bengali Association: 2012

Committees	Participating Members
Finance	Utpal Roychowdhury, Dilip Hari, Pranab Datta, Sambit Saha, Samir Biswas.
Publicity	Utpal Roychowdhury, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Aniruddha Banerjee, Sambit Saha, Ashim Datta, Manas Chatterji.
Puja Website	Anju Sharma.
Puja Magazine	Biru Paksha Paul, Pradipta Chatterji, Parveen Paul.
Puja Ayojon	Amol Banerjee (Priest), Aniruddha Banerjee, Damayanti Ghosh, Sheema Roychowdhury, Shantha Datta, Abha Banerjee, Maitrayee Ganguly, Sanjukta Nad, Pradipta Chatterji, Anasua Dutta, Anju Sharma.
Prasad & Bhog	Subal Kumbhakar, Pradipta Chatterji, Sheema Roychowdhury, Damayanti Ghosh, Sanjukta Nad, Anju Sharma, Manashi Paul.
Decoration	Damayanti Ghosh, Anika Kumbhakar, Ishika Kumbhakar, Rabin Das.
Lunch & Dinner	Subal Kumbhakar, Dilip Hari, Samir Biswas, Aniruddha Banerjee, Rabin Das.
Pratima	Pratima transfer to Hall: Sambit Saha, Subal Kumbhakar, Samir Biswas, Rabin Das.
Local Artist Cultural Program	Biru Paksha Paul.
Invited Artist Cultural Program	Dilip Hari, Aniruddha Banerjee, Sambit Saha.
Stage & Hall Management	Bijoy Datta, Rabin Das, Sambit Saha, Aniruddha Banerjee, Samir Biswas, Dilip Hari, Anju Sharma, Maitrayee Ganguly, Sheema Roychowdhury.
Reception	Utpal Roychowdhury, Sambit Saha, Aniruddha Banerjee, Dilip Hari, Samir Biswas.
Cross Functional Coordination	Sambit Saha, Utpal Roychowdhury, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas and Subal Kumbhakar.
Additional Patrons & Donors	Arindam Purakayastha, Manas Chatterji, Kanad & Indrani Ghosh, Subimal & Sudipta Chatterjee, Hiren & Dipali Banerjee.

সংগ্রামে বিজয়ং দেহিঃ

সম্পাদকীয়

শ্রীচৈতন্যদেব বাঙালীর সন্তান। নবদ্বীপের এই ধর্মপ্রচারক কলিযুগে নামসংকীর্ত্তনই বড় - তা শিখিয়ে গেছেন। দিন পঞ্জিকার ভাষ্যে কলিযুগ বলে কিছু নেই। তবে বর্তমান সময়ে পাপ বেড়ে গেছে এমন শাস্ত্রবাক্যে এটাই কলিযুগ। কবে এই কলিযুগ শুরু হয়েছে তার কোন তথ্য নেই। আর মানব সৃষ্ট পাপ কোন্ যুগে কম ছিল সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। দাদুর কাছে শুনতাম, সত্যযুগে সবটাই সত্য ছিল। ত্রেতায় তিনভাগ সত্য, একভাগ পাপ, দ্বাপরে সত্য মিথ্যা অর্ধাঅর্ধি। কলিতে তিনভাগ মিথ্যে আর একভাগ সত্য। ত্রেতাযুগে যে রামরাবণের যুদ্ধ হলো, সেখানে মিথ্যা বা পাপের ভাগ কম কোথায়। দ্বাপরের ভাতৃঘাতি যুদ্ধে পূণ্যের ভাগ খুবই কম। অতএব কলির প্রানীদের অতটা হীনমন্যতায় ভোগার কারণ নেই। বরং বর্তমান সময়েই মানবিক মর্যাদা ও কল্যানের লক্ষ্যে আগের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করা সম্ভব।

আবার শুরুতে ফিরে আসি। চৈতন্যদেবের আহবানে নামসংকীর্ত্তন বাঙালী হিন্দুর মধ্যে সারা জাগালেও জনপ্রিয়তার প্রশ্নে তা দুর্গা পূজাকে ডিঙাতে পারেনি। কেন দুর্গা পূজা বাঙালীর কাছে এতটা প্রিয়? কেন এটি তার কাছে প্রধান বাৎসরিক উৎসব - যেখানে কিনা এটা সম্পন্ন করার সাধ্য অধিকাংশ বাঙালী হিন্দুর নেই। পক্ষান্তরে নাম নামসংকীর্ত্তন সম্পন্ন করা যায় স্বল্পতম খরচে। তারপরও দুর্গাপূজার জন্য অধীর আগ্রহ! কত আয়োজন! দরিদ্র হলেও বাঙালী হিন্দু বিশ্বাস করে "আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।" এর কারণ বুঝতে হলে বাঙালীর মনস্তাত্ত্বিক গঠন ও নৃতাত্ত্বিক অবয়ব অনুধাবন করতে হবে। বাঙালী ঘরমুখো, অতিথিপরায়ণ। পারিবারিক বন্ধনের মধ্যেই সে জীবন, কর্তব্য ও আনন্দের পরমার্থ খুঁজে পায়। এ জন্যে ভগবতী তাদের জীবনে আসেন মাতৃরূপে। পার্বতী পুরো সংসার নিয়েই পূজা খেতে আসেন।

নামসংকীর্ত্তন জীবনকে আরো উদাস, আরো বৈষ্ণবীয় করে তোলে। কিন্তু দুর্গাপূজার গড়ন ভক্তকে আরো সংসারী আরো পার্থিব করে তোলে। বস্তুতঃ বাঙালীর গড়ন বৈরাগ্যে নয়। নিমাই তা বুঝেই মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন "কোটি জন্মের থাকলে ভাগ্য/ বিষয় ছেড়ে হয় বৈরাগ্য/সে ভাগ্য কি সকলেরই হয় গো?" এই বাঙালীকে চিনেই তো রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়/অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়।" দুর্গাপূজা এই অসংখ্য বন্ধনের সংসারকে আরো শক্তি, আরো বৈধতা দেয়। মেয়েরা যেমন বাপের বাড়ীতে নায়র আসে, ভবানীর আগমন ঠিক তেমন। এহেন অনুভূতির কারণেই দুর্গাপূজা বাঙালী হিন্দুর বৃহত্তম উৎসব।

তবে দুর্গাপূজা বাঙালী হিন্দুর জীবনে পারিবারিক গ্রন্থণা সঞ্জীবিত করে - শুধু এ কারণেই তা এতোটা প্রিয় নয়। মায়া মমতার পাশাপাশি দুর্গাপুজায় ধন, যশ ও প্রতিপত্তির কামনা-বাসনা বৈধতা লাভ করেছে। এরূপ কামনা বাসনা বৈষ্ণবীয় নামসংকীর্ত্তনে নিরুৎসাহিত। বাঙালী যুদ্ধের প্রস্তুতি না নিয়েও বিজয়ী হতে চায়। "সংগ্রামে বিজয়ং দেহিঃ" দুর্গাপূজার মধুরতম কামনা। শক্তির প্রার্থনা অলস বাঙালীরও যেন প্রিয়তম অধিকার। তার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তা বহলাংশেই অনুপস্থিত। তবু শৈশবে আমরা যেমন সবকিছু মায়ের কাছেই চেয়ে থাকি - বাঙালী হিন্দুর দুর্গাপূজা তারই একটি ধর্মরূপীয় আয়োজন মাত্র। সে অর্থে এটি অনেক বেশী ইহজাগতিক তথা সেকিউলার। সেজন্য একে 'সার্বজনীন' বলে বিলিয়ে দিতে বাঙালী হিন্দুর কার্পণ্য নেই। শাস্ত্রের পূজা মন্দিরে। বাইরে মানবিক মিলনের মহোৎসব।

"সংগ্রামে বিজয়ং দেহিঃ" - অবশ্যই। কিন্তু এই সংগ্রাম শুধু হিন্দুর হবে কেন ? এতো জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব বাঙালীর বিশ্বব্যাপ্ত কর্মযুদ্ধে প্রতিষ্ঠালাভের সংগ্রাম। দুর্গাপূজা বাঙালীর জীবনে পারিবারিক বন্ধন ও সেকিউলার চিন্তায় মনুষ্যত্ব সাধনার বার্তা নিয়ে আসুক প্রতিবছর। তখন বাঙালীর বিজয় হবে অনিবার্য।

- **সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষে বিরূপাক্ষ পাল**

ইচ্ছে করে

গঙ্গোত্রী সরকার

ইচ্ছে করে,
একটা এমন কবিতা হয়
যাতে আমার সকল কথা ফুরিয়ে যায়,
তোমার সকল প্রশ্নগুলো উত্তর পায়,
আঠেরো ঘা'র সতেরো দায়...
স্বীকার করি!

ইচ্ছে করে,
সেই কবিতায় মিলিয়ে দিই,
সকল হিসেব ক্ষয় ক্ষতি আর প্রতিশ্রুতি,
আমার সকল মন ও শরীরী পদ্ধতি,
যুক্তি মাফিক সাজিয়ে নিই,
সোনার তরী!

ইচ্ছে করে,
কবিতা পাই এমন বিপুল,
ভাসিয়ে ফেলুক যেথায় ছিল যার যত ভুল,
চুর করে দিক মার খাওয়া সব স্বেচ্ছামাশুল,
ধরিয়ে দিয়ে নতুন বকুল
ফুলের কুঁড়ি।

ইচ্ছে করে
একটা নতুন কবিতা হোক,
যেই কবিতা লেখেনি কেউ,
আর কোনো লোক
কথায় মুড়ে রাখব আমার হৃদয় গোলক
বাজার ছেড়ে হবই সহজ
ঘর-দুয়ারী...

আমাদের পূজো

উৎপল রায়চৌধুরী

দিব্যি কাটছিল গতকাল দিনটা। আস্তে ধীরে, ঢিমে তেতালা চালে। বিকেলে গিয়েছিলাম 'রসায়নে শিল্পসুষমা' নামে একটা বক্তৃতা শুনতে। রাতে বাড়ি ফিরে এসেই বিপদ। নাটকীয় ভাবে বললে 'বিনা মেঘে বজ্রপাত'। দূরভাষ যন্ত্রে বিরূপাক্ষ ছোট্ট একটুখানি বক্তব্য রেখেছে যে হিসেবের বাইরে একটু জায়গা থেকে গিয়েছে আমাদের শারদীয় ক্রোড়পত্রর 'অঞ্জলি'তে। ভরে দেবার ব্যবস্থা করতে ওটুকু জায়গার।

সে কি কথা! লেখা লেখি? সে তো লেখক লেখিকাদের কাজ। সেই ছোটবেলায় 'সন্দেশ' বলে একটা পত্রিকা ছিল। তাতে কাঁচা হাতের লেখা কয়েকবার পাঠিয়েছি। ছেপেছিলও দুতিনবার। তারপর যা হয় আরকি। আস্তে আস্তে ও পাট চুকে গিয়েছে অন্য সব রকম ব্যস্ততার মাঝখানে। পড়ার অভ্যেসটা একটু আধটু ছিল তবুও। উত্তেজিত অনুকনার বর্ণ বিচ্ছুরনের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ না দিয়ে সময় খরচা হয়েছে সমারসেট মম, আলবার্ট কাম্যুর রচনাবলী নিয়ে। কালে তাও থিতিয়ে এসেছে। এখনতো মাঝে মাঝে অনন্ত সমান্তরাল ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক রচনাগুলি ছাড়া সাহিত্য চর্চা বলতে তেমন আর কিছু নেই। তা বলে সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ। সেটাতো আর কিছুতে ফেলতে পারিনা।

মস্তিষ্কের চিন্তাকোষ গুলোকে হামানদিস্তায় পেটানো শুরু করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎই মনে হল আমাদের এই স্থানীয় পূজো প্রচেষ্টায় আমার জড়িয়ে যাওয়া নিয়ে দুকথা লিখবার এমন সুযোগটা কাজে লাগিয়ে ফেললে হয়। সত্যি এই অনুভুতিটা অপূর্ব। তবে তার আগে একটা কথা না বললে হবে না।

বছর দেড়েক আগে আমাকে হৃদয়ের দুর্বলতায় ভুগতে হয়েছিল। কবিতা পাঠ করে এ ব্যামো সারে না। দরকার হয়েছিল হৃদয়ের এখানে ওখানে প্লাসটিক, ধাতু কিম্বা তাদের মিশ্রনে তৈরি গোটা কয়েক নল বসাবার। তখন আমরা এখানকার পরিচিতজন সকলের কাছ থেকে শুভেচ্ছার যে সাড়া পেয়েছিলাম, তার তুলনা নেই। বিশেষ করে বাঙালীমহল যে ভাবে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মানসিক ভাবে, তা ভাষা দিয়ে রূপ দেবার শব্দভাণ্ডারই নেই আমার। তখনি ভেবেছিলাম ভাল হয়ে যাবার পর এখানকার সামাজিক কাজ কর্মে যতটা পারি সময় দেব। তারপর আস্তে আস্তে জড়িয়ে গেলাম ভাল ভাবেই।

বিংহামটন শহরের চারপাশ মিলিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার হয়ত অনেক লোকই আছে, তবে বাংলাভাষী ত্রিশ চল্লিশটি পরিবারের বেশি নেই। আমরা একে অন্যকে ভালভাবেই চিনি। দেখা হলে আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকে কুশল আদানপ্রদানে।

মেগা সিটির পূজোগুলোতে যে জিনিষের যথেষ্ট অভাব বলেই মনে হয় আমাদের। আর এই ঘরোয়া পরিবেশে কাজ করবার একটা আলাদা আনন্দ থাকে। 'কাজ'টা আর তখন কাজ থাকেনা। যত দিন যাচ্ছে,

এই অনুভূতিটা স্থায়ী রূপ নিচ্ছে আমার মনে। আমরা মোটামুটি তিনটে অনুষ্ঠান করি প্রতি বছর। বছরের শুরুতে সরস্বতীপূজো। গ্রীষ্মের আগমনী শুনবার আগেই নববর্ষ। আর তারপর শারদোৎসব অক্টোবর মাসে। তার মধ্যে দুর্গাপূজোটাই আমাদের সব চাইতে বড় অনুষ্ঠান। আজকের এই দ্রুতগতির জীবনধারায় কারো পক্ষেই যথেষ্ট সময় দেয়াটা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তাই অনেকদিন ধরে আমরা আস্তে আস্তে প্রস্তুতি নিতে থাকি। তবে যে জিনিষটা আমাকে মুগ্ধ করে তা হোলো আমাদের প্রত্যেকটি সদস্যের আন্তরিকতা। প্রত্যেকেই চায় অনুষ্ঠানগুলো সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠুক। যার যে কাজটুকু করবার কথা, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সে তা করে রাখে। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি সমাবেশে আমরা পাই নতুন ভাবনা, কি করে আরও ভাল ভাবে আমাদের প্রস্তুতিপর্ব সারা হবে।

দেবী দুর্গার অকাল বোধন করতে হয় আমাদের খানিকটা সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রয়োজনের তাগিদে। সপ্তমী থেকে দশমী পূজো সারা হয় আধ বেলাতে। তাই পূজোর আগের রাত্রিতে তৈরি করে রাখা হয় দেবীর আবাহন মঞ্চ। শারদ বন্দনার শুরু ভোরবেলা পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে। পূজোর অন্তে দেবীর চরণে সমবেত অঞ্জলি প্রদান। তারপর অতিথি আপ্যায়ন। প্রতিটি অনুষঠান সাফল্যের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে সবার সাহায্যের স্পর্শ পেয়ে।

শারোদৎসবের এই আনান্দধারা আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই সবার মাঝে। তাই পূজোর দিনের বিকেলে আয়োজন করা হয় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের। স্থানীয় শিল্পীদের কলাকুশলতার পরিচয় দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। তারপর নিমন্ত্রিত শিল্পীদের সুদক্ষ সুরের পরিবেশনে মনোরম হয়ে ওঠে সন্ধ্যাবেলার ঘণ্টাগুলো। অথিতিদের অনুরোধে বাংলা, হিন্দী সব রকমের সুরের ধারায় ভরে যায় প্রেক্ষাগৃহ। 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' রূপায়িত হয়ে ওঠে ক্ষনিকের জন্যে।

এই পরিবেশ, এই অনূভূতি। এর তুলনা নেই। আমি নিজেকে জড়িয়ে দিতে পেরেছি বলে ভাবি আমি সৌভাগ্যবান। আরও মনে হয়, এই কাজগুলোর মাধ্যমে সবার সাথে যোগসূত্রগুলো যে নতুন করে ঝালিয়ে নেয়া যায়, সেই পাওনাটুকুই বা কম কিসে?

অনেকেই আমরা ভাবছি, সম্ভব হলে, আগামি বছর মা দূর্গাকে নবকলেবরে আহবান করব। সেই ইচ্ছে যদি সত্যি রূপায়িত করতে হয়, তাহলে আমাদের সবাইকে অনেকখানি বেশি সময় দিতে হবে। অনেকখানি পরিকল্পনা চাই তার জন্যে। আমি তাকিয়ে আছি আগ্রহে, সবার মিলিত ইচ্ছে বাস্তবায়িত করবার প্রচেষ্টায় অংশ নিতে।

Oh Kolkata!

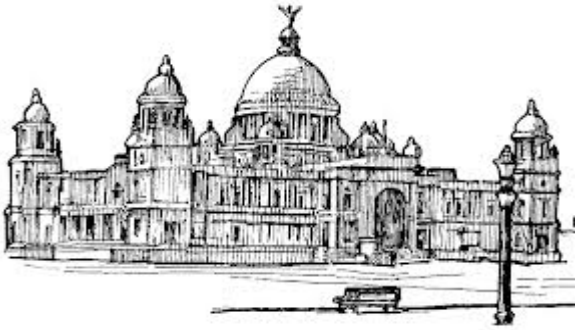

Dilip K Hari

Calcutta has always remained in my heart and will always remain there. How can you forget such a great and vibrant city especially when you have grown there? I always felt sad about not being able to live enough in Calcutta ever since I had left the “city of joy” at the end of my academic years to start my working life in New Delhi in the year 1983.

Since then I had lived in different continents throughout the globe. Bombay, Kashmir, Hyderabad, Nepal and Hong Kong in the Asia-Pacific; Baghdad in The Middle East; Mombasa, Nairobi, Dar-es-salaam and Kampala in Africa before finally arriving at the US shores.

For all the years before my arrival into US, I had religiously been going to Calcutta with my entire family for a minimum stay of 3 weeks every year. Annual vacation is a very natural thing in those parts of the world that I lived in and one could not simply avoid the temptation especially as the vacation along with travel expenses were always paid by the companies you worked for. However, that trend changed the moment I came to US. The vacation suddenly became a rare commodity. I am not sure why it became so; is it because life is harder in US without long vacation entitlement? Or travel costs are higher now because of the increased distance? Or because you do not get reimbursement of annual travel from your employer? Or because you are so happy and contented and life is so good here, you do not want to go away for more than a week or else you miss US? And may be one week is too short for a visit to your native country? Or your new home in US is so good that you want to forget your old one?

Anyway, whatever may be the reason the fact is, my trips to India became less and less frequent once I came to US. I am sure a lot of others are out there like me. As you visit India so less often now, the result is, you gradually start losing the immunity you need to withstand Indian conditions and way of life there. I am not talking only of physical and bodily immunity. I am also talking about losing your mental immunity. Not sure what I am talking about? Read the following portion and soon it will be clear to you.

I had the opportunity of visiting Kolkata recently although for a very short trip of 7 days. I had to allocate my total trip time between Kolkata my home city and Delhi my old work city.

I took Qatar Airways flight from JFK to Doha for onward connection Doha to Kolkata. This is the first time I went to Kolkata direct as on all previous trips my port of landing had always been Delhi or Mumbai for onward domestic connection to Kolkata. This trip gave me for the first time an insight into the state of airport facility at the Netaji Subhas Chandra Bose International Airport at Kolkata.

My flight landed at 3-00 am at Kolkata International Airport. As I approached the terminal building, I took a good look at the old building which looked to me as if the building did not get a single coat of paint since the time the building was first constructed decades ago. I proceeded to Immigration Counter. The first counter was meant for “special Needs”; the 2nd counter read “Diplomats”; the 3rd counter said “foreigners”; the 4th and 5th counters were meant for “Indians”. The queue at the 4th and 5th counters was long yet I stood there along with many others. After waiting in the queue for a good 30 minutes or so, one of the Immigration Officers suddenly appeared and told us we could go to any counter. I laughed at myself as I wasted 30 minutes for nothing all the while watching the empty counters. I also wondered why the counter signage was permanent and not dynamic which could be changed based on the size of the queue so that the passengers are not misguided. Anyway, I was happy to move to another counter where there were only two passengers in front of me. I thought I would clear fast thru this counter. However, soon I was disappointed again as I saw the Immigration Officer manning this counter was going out of

his desk for each immigration check to consult his superior who was standing in the area where passengers queued up at the terminal. I wondered why this officer was not trained before, as it clearly looked to me as if he was receiving on-the-job training. I fully agree that training is important but most of that should happen before they are assigned to live counter and at any other time but definitely not for flights arriving at 4-00 am when passengers are tired as most of them could not sleep in the aircraft. He took a good 30 minutes before he could clear the only two passengers who were ahead of me. I was totally restless by that time as I landed after 18 hours of flying and no sleep at all unlike the officer who must have had a nice sound sleep the night before. As I came up to the counter I knew he would again leave his counter to consult his superior. So I started by saying "Namaskar. Ami Kolkatar chele kolkatate phirchi, checking korar kichui nei". That worked like magic. He smiled for the first time and immediately opened my passport to put the rubber stamp. It took me just a minute to clear. I then thought to myself why the two passengers ahead of me did not try my technique which would have saved me at least a good 28 minutes. Oh, one more little observation. As I was standing in the Immigration queue, I wanted to get rid of the unwanted and used papers such as used boarding pass, ticket jacket etc. I carefully scanned the entire terminal to find a garbage can but found none. In the process though, I saw waste papers lying all over the terminal floors. Without a garbage can in sight, I decided to put back the waste papers I was holding in my hands into my pocket again against my wishes. In short, I found a lack of common sense in the areas observed thus far.

I then proceeded towards the baggage handling area and as the wait was unduly long at the immigration counter, I did not have to wait for my baggage again as it was already on the floor. Thanks to the airline staff who removed it from the conveyor belt and placed it on the floor for me to pick up. I then went past the customs check without any questions asked. May be the officer here was too tired at 4-30 am to ask any question. The other good thing was the money changing counter was open despite the fact that it was sleeping time for most of the people in Kolkata. Without this money changing facility, I am not sure how I could pay for the cab. I was quite happy at that. I then paid for the prepaid taxi which was not as bad as the queue was small. However another disappointment was just waiting outside the terminal at these wee hours in the morning. As I came out and proceeded to the prepaid taxi counter outside the terminal, they allotted me the taxi number. I found my allotted taxi and placed my baggage in the taxi. However, my taxi could not move out of the taxi bay until the five taxis ahead of me drove out. That took another approximately 30 minutes as the first taxi in the row was apparently waiting for one of the passengers out of a group who had some unfinished business at the terminal building making all of us wait behind them. I wondered who thought of a system such as this and built a small concrete barrier on the left side of the taxi bay preventing taxis to drive away in case any taxi in the front of the row has to wait for any reason such as the one I explained here. It was a good two and a half hours after my flight landed that I could finally drive away from this small, old, dilapidated, unclean and not so busy airport.

Now started the real sight-seeing segment of my trip as my taxi entered the VIP Road en-route to Salt Lake. It was early hours of morning when outside temperature was cool and so I pulled the windows down for some fresh and cool air. However, the air was anything but fresh. All along the road, my eyes were continuously getting drawn to the heaps of garbage piled on both sides of the road. The outside air was helping the bad smell of the garbage directly enter my nose. I immediately pulled the windows up. It looked to me as though there is a competition among people there for dumping the highest quantity of garbage right on the side of the road in anticipation of a reward. I wondered, if this is the condition of the VIP Road, the gateway to the city, get ready to see real stuff as you enter the interiors. Everyone understands that this is undoubtedly giving a very bad and dirty sense of arrival to all out-of-state and international visitors landing at Kolkata but people there are so immune that they do not want to think about it a bit.

The Salt Lake area is comparatively very clean though. Anyway, as soon as I reached home in Salt Lake, I noticed my US phone charger was not charging my Blackberry. I immediately realized that this was due to the different voltage system in India. So I decided to walk to the Reliance Cell Phone Store just two blocks from my home. I asked the Customer Service Staff there what the solution to my

problem is. He said “You have to phone the service center”. I said again “Look I am sure you know this, as many people from US and Europe must be coming to you with similar problem”. Like a broken record he again said “You have to phone the service center”. I was a bit annoyed at that and raised my voice a little. The Manager of the stores overheard our argument and came forward and asked me what my problem was. I explained to him and immediately he said “There is a Blackberry stores two blocks away, they can sort it out”. I was very pleased and thanked him before rushing to my new destination. Once in the Blackberry stores, I spoke to the staff there about my problem. He said “Your phone battery may have run out of its life”. I said “Until yesterday I charged my phone well in US, may be the problem is due to the voltage”. He was very kind not to keep arguing like the staff at Reliance and agreed to my suggestion of trying a local charger. Bingo, it worked. I bought the charger and that was a very happy moment for me as without your cell you feel like totally lost in this world and that feeling is quite scary and painful. I wondered again why people at the customer service here do not have common sense approach to problem solving.

During my stay in Kolkata, I had to travel frequently from Salt Lake to Ballygunge and Gariahat. I always took the famous EM Bypass. Although it is comparatively a newly built road, there is no lane marking on the road with the result people drive in every direction as they see any gap between cars causing the same traffic jam, people are used to see on every other road in the metro. I could never reach my destination in less than one and half hour which should ideally take no more than thirty minutes if people drive within lanes and in a straight line. I wondered why the city does not use common sense and do lane markings at least on newly built roads such as EM Bypass and why they do not understand that just by driving cars in any gap they find on the road to get ahead of the car just behind them do not take them far. Oh, the other thing I forgot to mention is, although the EM Bypass does not have garbage dumped on the sides as I saw on the VIP Road, they have not made any effort to improve the road sides for a better driving experience.

After 3 days of stay in Kolkata, I took a flight to New Delhi for a trip of 2 days. I was amazed to see how the city there was transforming. On my car ride from the airport to Gurgaon, my car was driving on a six lane highway and the roads were clean and the road sides were nice. This was a toll road. As I approached the neighborhood in Gurgaon, I saw tall, beautiful and modern buildings everywhere. I also saw hotels of international brands all around. For a while, I felt as if I was in some US city. As I visited the huge malls and the world class residences in the area on the following day, I was happy and proud to see the achievements of the people there. At the same time I was sad realizing Kolkata is at a minimum 50 years behind cities such as New Delhi.

I then returned to Kolkata again for another 2 days before my return flight to New York. This time I had to go and attend a dinner at my friend’s home at Ballygunge. I was meeting this friend after decades. I was meeting his wife and son for the first time in life. So after we finished our elaborate dinner, we kept on talking as we had a lot to catch up with each other. Finally I left his home at 1 am in the morning. My car started to drive thru EM Bypass. There was no traffic at that hour. However, barely 15 minutes on the road, I suddenly started feeling sick in my stomach. I realized my friend’s wife must have used some lactose product in any of the dishes out of many that she cooked with great care and love that night. As I am lactose intolerant, I knew I had to go to the nearest restroom without delay. I started looking for a roadside McDonalds, Burger King, Dunkin Donuts or even a gas station with a restroom. Soon I realized that I would find none here who would let me use a bathroom. So I asked the driver how fast we could reach Salt Lake. He said it would comfortably take at least another 30 minutes. However, that answer made me very uncomfortable. I told him to go to Picnic Garden instead which was nearby. I was lucky as my sister lived in the area where I could go and use her bathroom. I wondered what happens to people there if they cannot wait to answer a nature’s call. I wondered why in a metropolis of millions of people they do not think to find a solution to such problems for a better living experience.

On the day I was to catch my return flight, I was really looking forward to having my favorite Kolkata food for the last time this trip. So when one of my friends there invited me for lunch I immediately told him I want to lunch at Chungwah, a Chinese restaurant, on the Central Avenue. I can say with a lot of confidence that the chilly chicken they serve is so unique which

to this day I could find nowhere else. My friend later called me and said the restaurant was closed due to the holiday of 15th August. I then asked for his suggestion for an alternate venue. He said how about Mainland China at the South City mall. Although they serve fusion and not traditional Kolkata Chinese, I agreed. I was surprised to see the long queue of people trying to enter the mall. Later I was told that on any holiday the mall gets crowded like that. I stood in line for approx 10 minutes before they let me pass the security check exactly as we see at the airport in US. Most of the hotels and malls in India these days require everyone screened thru metal detectors. Anyway when I reached Mainland China, my friend who was waiting there told me that the waiting time before we get a table was a minimum 2 hours. I was in no mood for such a long wait for my lunch. So I suggested let's have Kolkata rolls, another favorite of mine. The mall had plenty of restaurants but we could not find a single one that serves rolls there. I was unhappy not finding a roll shop but utterly disappointed to find a Subway instead. Anyway, against my wishes, I had to go to an Indian restaurant at the mall for lunch. While lunching, I shared a little secret with my friend about my love for Kolkata food. Like on each trip to Kolkata, I went this time to one of my many favorite spots in the city to have Chinese food, I said to him. I went to Bar-be-Que on the Park Street for lunch. The moment food arrived, decades melt away and old memories came alive. On a hot summer day in Kolkata when people outside would be sweating, I would go inside an air-conditioned Chinese restaurant like Bar-be-Que and order a chilled beer which gets served with a bowl of peanuts followed by an order of chowmein with white gravy sauce on the top and dry chilly chicken. The joy was priceless to me. And this is a small luxury I love to indulge in on my each and every trip to Kolkata. Thanks to Bar-be-Que. They still maintain the same standard and taste to this day. Oh, the other small luxury I indulge in on my trip to Kolkata is to go to "macheer bazaar" to see the fish species on display and spend at least half-an-hour to select the one I like not realizing for a minute how smelly the whole fish market is. My friend laughed at that. They say people always enjoy and love things in life they have grown with. And I strongly believe in that.

Finally, in the evening on that day, I went to the same Kolkata International Airport to catch my return flight to NYC. This time I saw a bit more things at the airport that I missed when I arrived. I found that the Immigration Officers have so little knowledge about the job they should be good at and lack a reasonable communication and conversational skill. As I was waiting at the airport, I wanted to read a book. However, there were so many flies all around the place that I was busy changing seats to avoid the flies to no avail. It looked to me as if they never heard of a service called "pest control". I also had the opportunity of using the restroom there. I have in my whole life never seen repeat never seen an airport restroom so dirty, dark and full of smell as I saw there. I was so disgusted at all these that I kept on thinking about it on my return flight. As I landed at Doha for my onward flight to NYC, I felt even more depressed to find that even a young lady Immigration Officer at Doha knows her job pretty well and smiles and talks to you unlike what I just saw in my beloved city Kolkata. Immediately I knew that if there is a list of the worst international airports in the world, Kolkata International Airport undoubtedly shall top that list.

I kept on wondering how the old saying "What Bengal thinks today, India thinks tomorrow and the world day after" can be rewritten so that the phrase still has some meaning. So first I thought it should be rewritten as "What the world thinks today, India thinks tomorrow and Bengal day after". However, after a very careful deliberation I feel the appropriate thing to say would be "What the world thinks today, India thinks tomorrow and Bengal after half a century". It is in the hands of the people in Kolkata to wake up and act responsibly now for a fundamental and meaningful change of attitude if they want to retain the same old phrase in its original form.

Oh Kolkata-Why do I still miss you?

❁❁❁

Ode to Mahamaya

Sambit Saha

Where the soft wind chimes
Under the autumn October sun
Where the Susquehanna warbles
While making another lazy turn
I feel the color of your radiant saree
In red maples and orange elms
I smell the fragrance of your presence
In our scented hills and glens.

Where the hay is golden
And corn and apples grow
Where Route 96 and Farmer's markets
Have a cheerful glow
I worship you my Goddess mother
For the bounty you bestow.

When night falls in half our world
Demons and vampires abound
Without taking a buffalo form, they hide
In Abbotabad and Wall Street's Ashura town
Mahishashur Mardini, our dearest mother
Your light makes fiends flee
O divine protector from our tormenters
Our faith binds us to thee.

When dawn breaks out after a long fought night
The skies have a vermillion hue
Spotted owls and swans in Catskills woods
And mice and pea fowl too
Dream of frolicking with your children
And bring a smile to you.

Soon there will be winter
And water will freeze in creeks
Fleeting glimpses of your shapely shadow
Shall be seen in snow covered peaks
Your heavenly abode will always be
Where we will imagine it to be
And once again, winter, spring and summer
Will roll into another autumn, blissfully.

স্বপ্নের দেশ

অর্ণব দাশগুপ্ত

স্বপ্নের দেশ দেখবো বাসনা বাস্তব সাথে আড়ি -

কোথাও যদি বা না মেলে স্বপন আরও দূরে দিই পাড়ি।

খুঁজে ফিরি কতো দেশ মহাদেশ পর্বত সৈকত

স্মৃতি রয়ে যায় ছবি হয়ে মনে - নায়াগ্রা, নীলনদ.....

আকাশ যেখানে ছুঁয়েছে পৃথিবী যেথায় দৃষ্টিহারা

হয়তো সেখানে মিলবে ঠিকানা পথ চলা হবে সারা।

যদি ছিঁড়ে যায় এ স্বপন জাল হারাই আশার ঝুলি

তবু সবশেষে আছো তুমি জানি সে আশায় পথ চলি।

সবশেষে সেই স্বপনের দেশে তোমার চরণখানি

জুড়াবে আমার সকল জ্বালা, ঘুচাবে মনের গ্লানি।

তুমি যে আমার ভালোবাসিবার স্বপন দেখার ঠাঁই

নাও কাছে আরো বাঁধো যদি পারো কিছু আর নাহি চাই।

অংকনঃ অনুভব দাস ও সুকন্যা নাদ

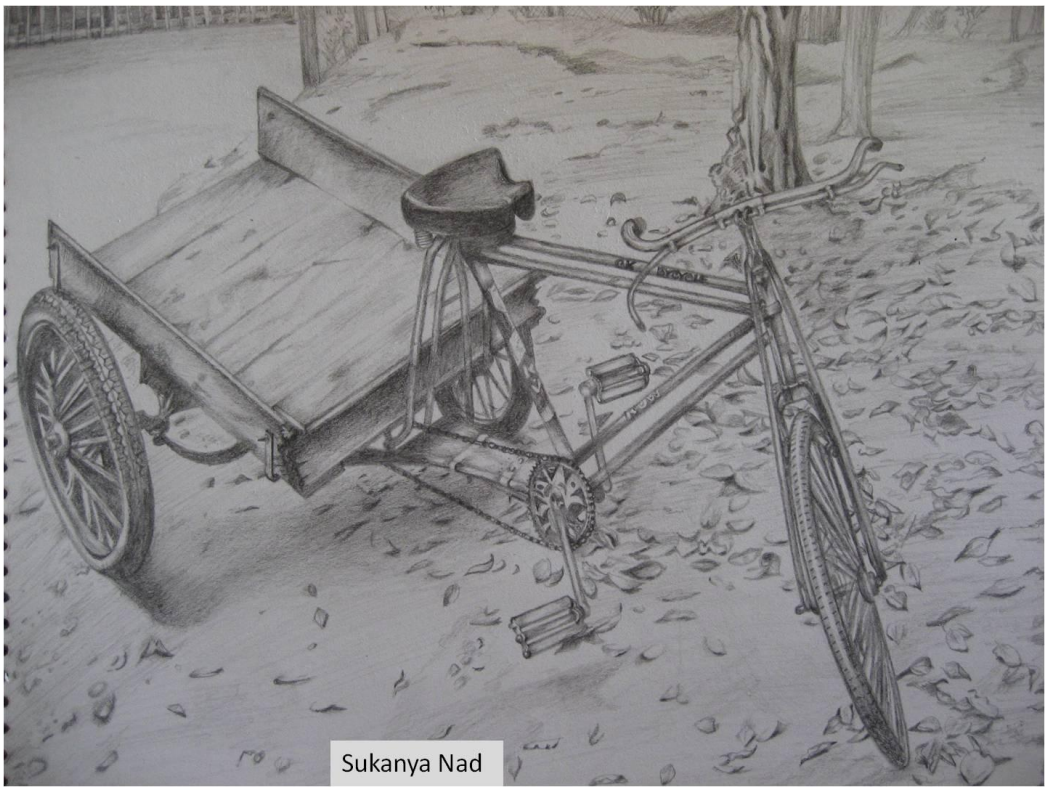

মরক্কোতে দুতিন দিন

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

মাদ্রিদ থেকে আমাদের রায়ান এয়ারের ফ্লাইট যখন মরক্কোর নাডোর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে দাঁড়াল তখন মাথার উপরে জুনের শেষের মাঝ-গগনের সূর্য প্রচণ্ড তেজে তাঁর রশ্মি ছড়াতে ব্যস্ত। এই এয়ারপোর্টটিকে আল আরোই বা আরোই এয়ারপোর্টও বলে থাকে স্থানীয় লোকজন। নাডোর শহর এখান থেকে ১৪ মাইলের মতো দূরে। ফ্লাইটের মতোই এয়ারপোর্টটি ও লোকে লোকারণ্য। বেশীর ভাগ মানুষই লম্বা ঢোলা আলখাল্লার মতো পোশাক পরেছেন, মহিলারাও তাই, তাঁদের মাথায় সব সিল্কের রুমাল বাঁধা, মুখগুলিও প্রায় দেখা যায়না, এত ঢাকাঢাকি, তবুও এই মহিলাদের সুদৃশ্য নেল পলিস রাঙানো নখ, আর পেন্সিল হিলের স্টাইলিশ জুতো ঠিকই চোখে পড়ে যায়। অনেকের হাতের বটুয়া থেকে আবার বেরিয়ে আসে হালফিলের আই ফোন। বেশ ভালই লাগে দেখতে।

মরক্কো যাচ্ছি ভেবে এতদিন অনেক উত্তেজনা মনের মধ্যে জমা হয়েছিল, এখন অনভ্যস্ত গরমের কষ্টে, আর একতলা একটেরে সাদাসিধে এয়ারপোর্টের বাড়ীটা দেখে মনটা একটু দমে গেল, তার ওপর দেখলাম চারিপাশে অনেক অনেক লোকের ভিড়। পরে জেনেছি যে এই সব লোকজনের বেশীর ভাগই বার্বার জাতির মানুষ, কর্মসূত্রে বাস করেন কাছাকাছি ইউরোপের নানা দেশে, জুন জুলাই মাসে এই মানুষেরা নিজেদের দেশে যাতায়াত করেন আর অনেকেই ব্যবহার করেন, রায়ান এয়ার; এটি হলো একটি কম বাজেটের এয়ারলাইন। বার্বার জাতির মানুষদের আসল বাড়ী হলো উত্তর মরক্কোর রীফ এলাকাতে।

কাস্টমস সেও খুব ভিড়, তবে সবাই বেশ ভদ্র, আমাদের বোধহয় বিদেশী বুঝে অনেকেই পথ ছেড়ে দিতে লাগলেন। কাস্টমস থেকে বেরিয়ে এসেই দেখলাম অত মানুষের ভিড় সরিয়ে হাসিমুখে আমাদের দিকে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছেন এক সোনালী চুলের সোনার বরনী। কয়েকটা মুহূর্ত লাগল তুরিয়াকে চিনতে, বেশ কয়েকটা বছর পরে দেখা হলো এদের সঙ্গে। তুরিয়ার পাশেই দেখা গেল এতক্ষণে, মাদ্রিদ ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক, স্পেনের মানুষ ফার্নান্ডো কে। মানসের সঙ্গে ফার্নান্ডোর পরিচয়, যোগাযোগ, আর শিক্ষা সংক্রান্ত আদানপ্রদান বহু বছরের, তবে বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে দেখা হলে চেনা মানুষকেও কেমন যেন অচেনা লাগে।

ওরা আমাদের নিয়ে চলল মেঠো পথ ধরে গাড়ী হাঁকিয়ে মাইল কয়েক দূরে তুরিয়াদের খামার বাড়ীর দিকে, সেখানে আমাদের দুপুরের লাঞ্চ খাওয়া আর বিশ্রাম নেবার নিমন্ত্রণ। প্রথমে কিছুটা পাকা রাস্তা তার পরে সম্পূর্ণ যাকে বলে ডার্ট রোড বা কাঁচা রাস্তা শুরু হলো, সেই পথ ধরে লাল টুকটুকে ভলভো গাড়ী ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আমরা শীঘ্রই পৌঁছে গেলাম।

চারিপাশে উঁচু পাঁচিল ঘেরা ইউরোপিয়ান স্টাইলে তৈরি একটি সাদা বাড়ীর বন্ধ গেটের সামনে। তুরিয়ার বারংবার ফোনের পর খুলে গেল বাড়ীটির সবুজ ভারি ফটক। গেটের মাথা ঢেকে রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ লালচে বেগুনী রঙের চেনা ফুলের থোকায়। ইংলিশ এল আকারের সাদা রঙের বাড়ী, সামনে তার পড়ে আছে লাল নুড়ি বিছানো খানিকটা জায়গা, সেখানে ফার্নান্ডো তার গাড়ীটা পার্ক করলো। এসে দাঁড়াল তুরির বাড়ীর লোকজন; দাদা, দিদি, ভাই, ভাইবউ, ভাইপো, ভাইঝি সবাই, সবশেষে এলেন তুরির মা। তুরির স্প্যানিশ মা আজও ভারী রূপসী, তুরির মরোক্কান বাবা ছিলেন এদেশের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার, মরক্কোর রাজাদের সঙ্গেও তাঁর ছিল কিরকম যেন আত্মীয়তা, তুরি অল্পবয়সে পড়াশুনো করেছিল প্যারিসে। তুরিয়া কে তার নিজের লোকেরা অনেক সময় তুরি বলে ডাকে, তাই আমিও তুরি বলতে শুরু করে দিয়েছি। সব শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলো ছ

ছখানা কাল বাছুরের মত দেখতে মস্ত মস্ত কুকুর। এসেই তো তারা আমাদের শোঁকা-শুঁকি শুরু করে দিল।

এদিকে ভেতরের ঘরে আমাদের জন্য লাঞ্চের এলাহি ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা গরু বা শুয়োরর মাংস খেতে হয়ত পছন্দ করবোনা ভেবে তুরির মা অ্যান্তোনিয়া নিজের হাতে ভেড়ার রোস্ট রান্না করেছেন। সঙ্গে রয়েছে নানা পদের আনুষঙ্গিক খাবার। শেষ পাতে এলো ঝুড়ি ভর্তি রকমারি সুস্বাদু ফল, সবই মরক্কোর ফসল। সবশেষে পরিবেশন করা হলো তাজা পুদিনা পাতা দেওয়া সবুজ চা, সোনালী কারুকার্য করা ছোট ছোট পেয়ালা পিরিচে করে। এই সবুজ চা খাওয়া নাকি এখানকার একটি বিশেষ প্রথা। খাবার পরে তুরির পরিবার আমাদের আমন্ত্রণ জানাল ওদের বাড়িঘর দেখবার জন্য। খামার বাড়ীর সঙ্গে লাগোয়া রয়েছে বেশ কয়েক একর জমি, তার মধ্যে আছে আস্তাবল, সেখানে থাকে এদের আরবি ঘোড়ারা আর তাদের বাচ্চারা। এছাড়া আছে কয়েকটি ভেড়া, ও আরও কিছু কুকুর। নাম না জানা অনেক গাছপালা ছড়ানো রয়েছে। আর মিষ্টি ও বুনো ফল বা ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে, আমরা সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

তুরিয়ার পরিবার চাইছিল খাওয়াদাওয়ার পরেও আমরা খানিকক্ষণ সময় কাটাই ওদের সঙ্গে গল্প করে, যদিও ফার্নান্ডো আর তুরি ছাড়া এদের কেউ ইংলিশ বলতে বা বুঝতে পারে না। অনেক মানুষ বোধহয় নতুন মানুষের সান্নিধ্যেরই অনেক দাম দেয়, তাদের কাছ থেকে নতুন কিছু জানতে চায়। আমরা এদিকে নিজেদের জীবনের ব্যস্ততার জালে এতই জড়িয়ে গেছি যে সব সময়েই সময়ের হিসেব করি। অল্পক্ষণ পরে আমরা ফার্নান্ডো আর তুরির সঙ্গে নাডোর আর মেলিলার উদ্দেশে যাত্রা করলাম তুরির আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে।

আবার চলল গাড়ী, এবারে নাডোরের উদ্দেশে। নাডোর শহরে সবই আছে, বড় বড় বাড়ী, অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স, ব্যাংক, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, সুপারমার্কেট, ইত্যাদি, কিন্তু চারিদিকে তাকালে মনে হয় সৌন্দর্যের যেন বড় অভাব। তবে নাডোর সমৃদ্ধশালী শহর। এখানকার খনিজ ধাতু ও বস্ত্রশিল্প এদেশের আয় বাড়াচ্ছে, এছাড়া বিভিন্ন দেশে প্রবাসী নাডোরের মানুষেরাও নানা প্রয়োজনে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন নিজের দেশে। দুঃখের বিষয়,পুলিশের চোখ এড়িয়ে বর্ডার পেরিয়ে বেআইনি জিনিষপত্রের আদানপ্রদানও নাডোরের ঐশ্বর্য বাড়াচ্ছে।

নাডোর ও মেলিলা দুটি পাশাপাশি শহর। নাডোর শহর মরক্কোতে, আর মেলিলা এখনও স্প্যানিশদের দখলে, তাই দুই শহরের চেহারার পার্থক্যও বেশ নজর কাড়া। নাডোরের পাশে মেলিলাকে যেন বড় বেশী ঝকমকে আর সাজানো-গোছানো মনে হয়। প্রতিদিনই বহু মানুষজন যাতায়াত করেন নাডোর থেকে মেলিলাতে,আবার মেলিলা থেকে নাডোরে। এই যাতায়াত বেশ কষ্টকর এবং অসম্ভব সময়সাপেক্ষ। দুই শহরের মাঝে বেশ কয়েকটি চেকপয়েন্ট রয়েছে, যেখানে পুলিশকে বা সিকিউরিটি অফিসে পাসপোর্ট, অথবা অন্যান্য পরিচয়পত্র দেখাতে হয়, এছাড়া গাড়ীর পিছনের হুড খুলেও সিকিউরিটির লোক পরীক্ষা করে। লম্বা লাইন এই সমস্ত জায়গাতে। এদিকে ট্রাভেল গাইডের বইতে পড়লাম যে অনেক নিষিদ্ধ জিনিষ নাকি দিনের আলোতে পুলিসের চোখের সামনে দিয়ে স্বচ্ছন্দেই এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাঠান হয়।

সারা দুপুর ধরে বহু মানুষের ভিড়ের মধ্যে এইসব পুলিশ ও সিকিউরিটি লাইনে অপেক্ষা করে, আর প্রখর সূর্যের তাপ সহ্য করবার পর সন্ধ্যার পরে আলো ঝলমলে মেলিলাতে পৌঁছে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। চমৎকার সাজানো শহর। মেলিলাকে মরক্কোর শহর বলে মনেই হয়না যদিও এখানকার চল্লিশ শতাংশ লোকই মরোক্কান। স্পেনের বার্সিলোনার সঙ্গে খানিকটা তুলনা করা যায় এই শহরের। মেলিলা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকুল বরাবর অবস্থিত, বারো স্কোয়ার কিলোমিটারের একটি অর্ধবৃত্তাকার গঠনের জমি নিয়ে এই শহরটি তৈরি হয়েছে। এখানে ছড়িয়ে আছে

অনেক মধ্যযুগীয় দুর্গ ও বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় মিউজিয়াম। সারা শহর জুড়ে স্থাপত্যশিল্প আর ইতিহাসের মাখামাখি। বিভিন্ন জাতীর মানুষের বাস মেলিলাতে, এঁদের বেশীরভাগই খৃস্টান এবং বার্বার মুসলিম। এখানে দুএকটি সেনাগগ আর হিন্দুদের মন্দিরও আছে। সেনা বাহিনীর পোশাক পরা লোকজনকেও দেখা যায় আশে পাশে চলাফেরা করতে, বোধকরি স্পেন ও মরক্কোর সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টাতে কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। মেলিলার নাগরিকদের কাছে নাকি ব্যবহারিক জিনিষপত্র অথবা কনস্যুমার গুডস এর চাহিদা বেশ বেশী, সেইজন্যও আইন-বিরুদ্ধ কেনাবেচা বাড়ছে, আর শোনা যায় এইজন্যই নাকি চারিপাশে এত প্রাচুর্যের সমারোহ।

আমরা অবশ্য তখনকার মতো ক্লান্ত শরীরে চমৎকার হোটেল পারাডরে ঢুকে বাঁচলাম। মস্ত বড় বড় উঁচু উঁচু কড়িকাঠ দেওয়া সব ঘর, দামী কাঠের মেঝে আর তাতে মানানসই কাঠের আসবাব দিয়ে সাজানো হোটেলটি। আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখা যায়। আমাদের আর খাবার ইচ্ছে ছিলনা অত রাতে তবে স্পেনের লোকেরা দেখেছি অনেক রাতে ডিনার খায়, অন্তত: গরম কালে। তুরিরা গেল স্যান্ডুইচ কিনতে, ওরাও এই হোটেলে থাকছে, আমাদের পরেরদিন বেড়াতে নিয়ে যাবে বলে।

সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট খেতে গেলাম বিশাল গোলাকৃতি খাবার ঘরে, এই ঘরটা থেকে প্রায় পুরো মেলিলা শহরটা দেখা যায়। খাবারের ছড়াছড়ি, নানা রকমের সসেজ, অন্যান্য কোল্ড কাট্ স, ফলের রস, বিভিন্ন ধরনের পাউরুটি থরে থরে সাজানো রয়েছে সুধু নেই আমার পছন্দের স্বাদের চায়ের ব্যাগ। বাধ্য হয়ে কফি নিতে হলো, কফি অবশ্য খুবই ভাল তবে একটু বেশী কড়া।

লবিতে এসেই দেখি তুরি আর ফার্নান্ডো বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে, ওরা বোধহয় ব্রেকফাস্ট খায়নি, কাল অনেক রাতে স্যান্ডুইচ খেয়েছে তো।

গাড়ী তে সবাই উঠে বসা হলো, কিন্তু কোন আলোচনাও হলো না আমরা কোথায় যাচ্ছি সে বিষয়ে। গাড়ী তো চলতেই লাগল। বাইরে প্রচণ্ড রোদের তাপ, গাড়ীর সামনের দুই দিকের জানলাই খানিক করে খোলা, বেশ হাওয়ার ঝাপটা লাগছে পিছনের সিটে, এরা বোধহয় আমাদের মতো সবসময় গাড়ীর ভিতরে এয়ারকন্ডিশন চালায় না। অজানা পথ ধরে গাড়ী ক্রমান্বয়ে চলতেই থাকলো, কেউই কোনও কথা বলছেনা। বাইরে দুই ধারে ভেসে চলেছে অপরিচিত সব দৃশ্যের সারি। কখনও মাইলের পর মাইল ধরে দেখছি উঁচু নিচু লালচে পাহাড়ের এক দিক, পাহাড়ের গায়ে প্রকৃতির তৈরি বিভিন্ন রকমের অপরূপ কারুকার্য।

এই কারুকার্যের ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে ইরোশনের দরুন পাহাড়ের ধারগুলি ক্ষয়ে যাওয়ার জন্য। কিছু পরে এই দৃশ্য গেল বদলে, শুরু হলো সবুজ কার্পেট বিছানো শস্য শ্যামল প্রান্তর আর মাঝে মাঝে লাল টালির ছাদের ছোট ছোট বাড়ী, হয়তো কোন অখ্যাতনামা গ্রামের পাশ দিয়ে তখন চলছিলাম আমরা, এরপরের দৃশ্যে দেখতে লাগলাম বালি আর বালি আর দূরে দেখা যেতে লাগল সমুদ্রের অসমতল উপকুল।

ঘণ্টা দুই পরে গাড়ী থামল বালির মধ্যে একটা ছোট রেস্ট এরিয়াতে, সেখানে কোক, ফানটা ইত্যাদি খাওয়া হলো আর আন্দাজে বুঝলাম যে আমরা চলেছি ভূমধ্যসাগরের উপকুলের রীফ ধরে পশ্চিম দিকে। এয়ারপোর্টে দেখা বার্বারদের আদি বাড়ী হচ্ছে এই ভূমধ্যসাগরের রীফ এলাকায়। মরক্কোর উত্তর সীমারেখা দিয়ে ক্ষীণ-চন্দ্রাকার আকারে বিস্তৃত এই অঞ্চল।

এখানে ছড়িয়ে আছে বহু বালুকাময় বেলাভূমি, আছে অনুচ্চ পর্বতমালা আর অনেক ছোট ছোট গ্রাম। দূরে দেখা যায় উঁচু পাহাড়ের সারি ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে। এই ভূমধ্যসাগর দিয়েই প্রতিবেশী দেশগুলি এসে দখল

নিয়েছিল মরক্কোর; ১৫ শতাব্দীতে আসে পর্তুগীজরা, তারপরে আসে স্পেনের মানুষেরা। স্পেন আজও তার দখল রেখেছে মেলিলা আর সিউটা নামের দুটি শহরে। ফার্নান্ডো হয়তো উত্তর আফ্রিকার এই মহিমান্বিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুভব করবার একটু অভিজ্ঞতা দিতে চেয়েছিল আমাদের, তাই আগে থেকে কিছু বলেনি কারণ এটা ছিল ওর সারপ্রাইজ।

ফেরবার পথে কোনও একটা গ্রাম বা ছোট শহরে ঢোকা হলো দুপুরের খাবারের জন্য। রঙ ওঠা প্লাস্টিকের টেবিল ক্লথ পাতা রেস্টুরেন্টটা দেখে খিদেটা একটু কম কম লাগছিল তবে কাছাকাছি আর কোনও খাবার জায়গা না থাকার দরুন এখানেই ঢুকতে হলো। আমরা যদিও নিরামিষাশী নই তবুও এদেশের মানুষদের মতো এত পরিমাণে মাংস প্রতিটি খাবারের সঙ্গে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যেয় খেতে অভ্যস্ত নই। তুরিয়ারারা আমাদের অবস্থা বুঝে মাছের অর্ডার দিল। মাছ বলতে এসব দেশে আবার নানারকম সামুদ্রিক জীবজন্তুও বোঝায়। খাবার এলে দেখলাম বিশাল থালায় সাজান চিংড়ি, কালামারি, স্কুইড, ও অন্যান্য ছোটবড় আস্ত মাছ বেশ কড়া করে ভাজা। তুরি শুনলাম কালামারির ভীষণ ভক্ত তাই সে দেখলাম সুধুই কালামারিভাজা খেতে লাগল, আমার ছোট ছোট সার্ডিন ভাজা বেশ খেতে লাগল, মানস এক ধারে পড়ে থাকা লম্বা লম্বা লাঠির মত পাউরুটিগুলো খেতে লাগল, আমার ইশারা করে বারণ করা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, কারণ আমি দেখেছিলাম যে ওই রুটিগুলির ওপরে অনেক মাছি বসেছিল। ফার্নান্ডো যে খাবারগুলো বাড়তি পড়ে রইল সেই খাবারগুলি খেল। শেষে মস্ত-বড় তরমুজ সবাই মিলে খাওয়া হলো। এই সময়ে মানসের হঠাৎ ম্যাকডোনাল্ডের ফ্রেন্চফ্রাই খাবার ইচ্ছে জাগল, জিগ্যেস করে বসল এখানে কাছাকাছি ম্যাকডোনাল্ড আছে কিনা, আসলে বোধহয় ওর খিদে মেটেনি শুধু পাউরুটি খেয়ে। আমি তো অপ্রস্তুত হয়ে বারবার তুরি ও ফার্নান্ডোর কাছে ক্ষমা চাইলাম এই ছেলেমানুষি আবদারের জন্য। ওরা কিন্তু হেসে হেসে ওয়েটারকে অনেক কিছু বলল নিজেদের ভাষায়, আর একটু পরেই মোটা মোটা একরাশ সাদা সাদা গরম আলু-ভাজা এসে হাজির। আমরা দুমিনিটেই সব আলু-ভাজা শেষ করলাম, তবে তুরি বলল যে এগুলো ঠিক ম্যাকডোনাল্ডের মত হয়নি।

পরের দিন সকালে মেলিলা ও নাডোরের বাজারে আমাদের কিছু কেনাকাটা করিয়ে তুরি আর ফার্নান্ডোর আমাদের এয়ার পোর্টে পৌঁছে দেবার কথা। আমরা যখনই কোন নতুন দেশে যাই, সেখানকার তৈরি অপ্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস কিনে বাক্স বোঝাই করি। মরক্কোতে নানা জিনিষ পাওয়া যায় শুনেছি, তবে আজকাল প্লেনে জিনিষপত্রের ওজন সম্বন্ধে খুব বেশী কড়াকড়ি, এছাড়া খুব একটা আকর্ষণীয় অথচ এদেশে তৈরি, এ রকম জিনিষ মেলিলা বা নাডোরে অল্প সময়ের মধ্যে আমার চোখে পড় ছিলনা। তাই ওদের আর কষ্ট না দিয়ে তাড়াতাড়িতেই কেনাকাটা শেষ করলাম।

তুরিরা আমাদের পৌঁছতে এলো সেই একই এয়ারপোর্টে। এবারে আর অত ভিড় বলে মনে হলো না, গরমও যেন অনেক কম লাগল। আমরা সবাই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ফার্নান্ডো আবার কিছু মরোক্কান টাকা আমাদের হাতে গুঁজে দিয়ে গেল যদি দরকারে লাগে বলে। আমরা এটা ওটা কিনে মরোক্কান টাকা সব খরচ করে ফেলেছিলাম। আবার সেই রায়ান এয়ারের উঠবার জন্য লাইন দিতে হলো, তারপরে ভিড় হতে শুরু হল। আমরা সামান্য কিছু বেশী দাম দিয়ে সিট রিজার্ভ করেছি বলে আগে উঠে বসতে পেলাম। পিছনে কত মানুষ ছোট শিশুদের নিয়ে দাঁড়িয়ে। এত খারাপ লাগছিল তা বলবার নয়। অবশ্য সবাই একবার প্লেনে উঠে পড়বার পর রায়ান এয়ারের পরিচালনাকারী তিনটি অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে সব যাত্রীদেরই যত্নের সঙ্গে দেখাশুনা করতে লাগলেন। আমার তখন একটু একটু তন্দ্রার ভাব আসছিল, তাই তুরি আর ফার্নান্ডোর কথা ভাবতে ভাবতে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়লাম।

মাতৃবরণ

মানসী রানী পাল

বছর ঘুরে শরৎ এলো
কিযে আমার লাগছে ভালো।
করবো মাগো তোমার পূজা
মা যে আমার দশভূজা।
অজান্তে হয় পাপ যে জমা
সে পাপ তুমি করবে ক্ষমা।
তোমার পায়ে এই অর্চনা
আমায় কর মুক্তমনা।
ভক্তি দিয়ে শক্তি যাচি
তোমার কৃপায় তাইতো বাঁচি।
চাই যে তোমার কোমল চরণ
অন্তর দিয়ে করবো বরণ।

মহালয়ার স্মৃতিকথা

দেবাশীষ পাল

শরতের আকাশ, অমাবস্যা তিথি হলেও
তেমন আঁধার নয়।
রাতের শেষ প্রহরে চারিদিকে হৈ চৈ,
শুরু হবে মহালয়া।
আপন আলয়ে বাবার আহবান, জেগে উঠ।

দেবদুলাল, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের সুরেলা বর্ণন -
"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।"
এ যেন হিমালয় পর্বতের কণ্ঠবর্ষণ, মানবের নয়।
মাঝে মাঝে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, গদাধারী
মায়ের আগমন বার্তা,
পরক্ষণেই হেমন্ত, মানবেন্দ্র,
প্রতিমাদেবীর অমৃত সুর -
"জাগো দুর্গা, জাগো দুর্গতিনাশিণী মা।"

আকাশবানী কেন্দ্রে কান পেতে রেখেছে
বঙ্গ সন্তানেরা।
পূর্ব দিগন্তে সূর্য কিরণের রক্তিম আভাস।
মহালয়ার শেষাংশে মহিষাসুর বধে মায়ের
রুদ্র মূর্তির প্রকাশ।
ষষ্ঠী থেকে দশমী পূজা, নানা উপকরণ দিয়ে
মায়ের আবাহন।

এ দিনগুলোর আনন্দঘন স্মৃতিকথা
আজও অতীত নয়,
অন্তরমাঝে এখনও বর্তমান; থাকবেও চিরকাল।

আমাদের আল্পস্

দময়ন্তী ঘোষ

সুইটজারল্যাণ্ড খুব সুন্দর দেশ - ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। লোকের বাড়িতে টেলিভিশনের বড় স্ক্রীনে হিন্দি ছবির নায়ক-নায়িকাদের নাচগানের পটভূমিকা হিসেবে ওদেশের আল্পস্-এর দৃশ্য দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। শুনেছি সবকিছুরই আকাশছোঁয়া দাম (যদিও বলিউডের কাছে খোলামকুচি)। সুতরাং কেউ সুইটজারল্যাণ্ড গেছে শুনলে খুবই চমৎকৃত হয়েছি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, নিজের কখনও খুব একটা শখ হয়নি যাবার - যদিও দেশবিদেশ বেড়াতে খুবই ভালবাসি। বোধহয় মনে হয়েছে - পাহাড়-প্রকৃতি দেখতে ইয়োরোপ যাবো কেন? আমেরিকাতে কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভাব? এখানকার (ও ঘরের পাশের কানাডার) রকি পর্বতমালা কম কিসে? আর বিংহ্যামটনে বসে বরফ তো কম দেখি নি! ইয়োরোপ যাব ইতিহাসের জন্য - যেটাতে আমেরিকার একটু কমতি। এবারের গরমের ছুটিতে কিন্তু আমার পরিবারের বাকী সদস্যরা জেদ ধরলো যে এবার সুইটজারল্যাণ্ড যাবে। ভাগ্যিস ধরলো - তাই আমার বেড়ানো হলো দেশটা। না গেলে কি বুঝতাম - সুইটজারল্যাণ্ড-এরও "ইতিহাস" আছে, আর সুইস্ আল্পস্ মানেই বলিউডি ঝ্যানচ্যাক অথবা বনেদী বড়লোকী ব্যাপার না - আল্পস্-এর স্বর্গীয় সৌন্দর্য যে যার নিজের মত করে উপভোগ করার ব্যবস্থাও আছে সেখানে! এই ভ্রমণকাহিনীতে ইতিহাসের কথা থাক, প্রকৃতি উপভোগের কথাই বলি।

আমাদের যাত্রার এই পর্বের কেন্দ্রবিন্দু যেরম্যাট সুইস্ আল্পস্-এর কোলে পাঁচহাজার ফুট উচ্চতায় হাজার ছয় লোক নিয়ে ছোট শহর। হাজার হাজার স্কি-প্রেমীরা বিভিন্ন দেশ থেকে আসে এখানে থেকে আল্পস্-এ স্কি করতে। পাহাড়ের তলা থেকে যেরম্যাট-এ যাবার জন্য আলাদা রকম খাঁজকাটা চাকা ও লাইনওয়ালা (কগ্ হুইল) ঝকঝকে ট্রেন লাল রঙের। ট্রেন চলা শুরু হতে না হতেই কোন দিকে তাকাবো ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারিনা। চারদিকের দৃশ্য এতই সুন্দর। প্রথম দিকে পাহাড়ের মাঝের উপত্যকা, নদী, ঝর্ণা - পরে বরফ ঢাকা উঁচু পাহাড়ের চূড়োগুলো। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি! যাত্রীদের এরকম অভিজ্ঞতা জেনেই নিশ্চই ট্রেনটার জানলাগুলো ছাদ ছোঁয়া।

যেরম্যাট-এ পৌঁছে কিন্তু একটু ধাক্কা খেলাম। বেশ ভিড়। খুবই সুন্দর রঙীন ফুলে সাজানো শহর। কিন্তু একেবারেই যেন বাইরের লোককে দেখানোর জন্য। স্টেশনের গায়ে টুরিস্ট অফিসে খোঁজ নিলাম শহরের বাইরে কাছাকাছি কোথায় ছোটোখাটো হাঁটতে যাওয়া যায়। তারপর মালপত্র টানতে টানতে হাঁটা দিলাম বাসস্থানের দিকে - মালপত্র রাখতে। ভালো খবর হলো যে এ শহরে সাধারণ পেট্রল বা ডিজেল গাড়ী নিষিদ্ধ। নিতান্ত প্রয়োজনীয় যানবাহন বিদ্যুতশক্তিতে চলে। মাল রেখে ফিরে এলাম ভিস্পা নদীর ধার দিয়ে শহরের টুরিস্ট-অধ্যুষিত কেন্দ্রস্থানে। এখান থেকে একটা ফিউনিকুলার নিয়ে আরও হাজার দুই ফিট উঁচুতে সানিগ্যা প্যারাডাইস থেকে আমাদের 'ছোটোখাটো হাঁটা'র শুরু।

প্যারাডাইস-ই বটে। চারদিকে বরফে ঢাকা পাহাড়ের মাঝখানে একটা উঁচু উপত্যকায় একটা খাবার দোকানের বিশাল চত্বর - ওপরে পরিষ্কার নীল আকাশ - চারদিকে ঝকঝকে রদ্দুর। একটু চা খেতে বসতেই হলো। তারপর আমাদের হাঁটার শুরু। প্রথম আধঘন্টাখানেক তো আশপাশ দেখতেই মুগ্ধ। খোলা আকাশের নীচে চারদিকে উঁচু পাহাড়, বড় বড় পাইন

গাছের ভেতর দিয়ে ম্যাটরহর্নও দেখা যায় - তবে একটা ছেঁড়া মেঘের ওড়নাতে মুখ ঢাকা। আরও দূরে গ্লেসিয়ারও দেখা যায় খেয়াল করলে। ক্রমশঃ খেয়াল হলো - আমরা ছাড়া আর লোকজন দেখিনি কিন্তু এতটা পথে! ভুল পথে আসছি না তো! কোনও সাইনও নেই কোথাও। পরিবারের কর্তা আশাবাদী - পথের শুরুতে তো লেখা ছিলো পথটা যেরম্যাট যাবে - সুতরাং হাঁটতেই থাকা যাক। আরও আধঘন্টাখানেক পরে একজন মানুষের দেখা পাওয়া গেল। সে কিন্তু ফিরে আসছে পথের দিশে না পেয়ে - যদিও আমাদের আশা দিলো: পৌঁছে নিশ্চই যাবে। আমরাও হাঁটতেই থাকলাম - যদিও পথটার নিচের দিকে যাবার কোনও নামগন্ধ নেই। আসলে ফিরে যেতে কারুরই ইচ্ছে করছে না। যত এগোচ্ছি - নতুন নতুন দৃশ্য। এখন চলে এসেছি এমন জগতে - যেখানে "দ্য হিল্‌স আর এ্যালাইভ উইথ দ্য সাউন্ড অব মিউজিক" (সেটা অবশ্য ছিল অস্ট্রিয়ার আল্পস্)। তার ওপর উপরি পাওয়া ঝর্ণা এদিক ওদিক। একটু যে চিন্তা হচ্ছে না তা নয়। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। বাসস্থানে ঠিক সময়ে চেক ইন করতে না পারলে রাতে থাকবো কোথায়?

অবশেষে একজায়গায় মনে হল রাস্তাটা নিচের দিকে যাচ্ছে। গৃহকর্তা সময় বাঁচানোর জন্য আমদের পথ থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ঢালু গা দিয়ে সরাসরি নেমে গেলো ছুটে। বাবার মত অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মেয়ে ছুটে নামতে গিয়ে সামলাতে না পেরে গড়গড়িয়ে ধপাস। ব্যথাতো লেগেছেই - তার ওপরে কোন গাছের পাতায় ঘষা গিয়ে সারা হাত জুরে র‍্যাশ। মার বকুনি শুরু হলো বাবাকে - মেয়েদের সামনে এরকম দায়িত্বহীনতার নিদর্শন দেওয়ার জন্য। অন্য মেয়ে বোনের পরে যাবার ছবি তুলছিলো। মায়ের রকম সকম দেখে তাড়াতাড়ি ক্যামেরা বন্ধ করে নেমে এসে বোনের তদারকি করতে ব্যস্ত হলো। যখন সকলে নিশ্চিন্ত হলাম মেয়েটা গোটাই আছে আর ব্যাকপ্যাকের মলমটা মনে হচ্ছে কাজ শুরু করেছে র‍্যাশ-এর জ্বালা কমাতে - তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। পরে হাঁটতে হাঁটতে পরিস্থিতিটার কথা ভাবতে গিয়ে সকলেই দেখি হেসে ফেটে পরছি। শেষপর্যন্ত যখন বাসস্থানে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। ওপর থেকে হাঁটতে শুরু করেছিলাম বিকেল সাড়ে চারটেয়। সকলেই বেশ ক্লান্ত। কিন্তু সকলেই এরকম 'ছোটোখাটো হাঁটা' আল্পস্-এর কোলে আবারও হাঁটতে রাজী -আল্পস্ সকলকে এমনই বশ করে ফেলেছে।

পরের দিন সকালটা ঝকঝকে। মেঘের ঘোমটা খোলা ম্যাটরহর্নকে দেখা গেলো পোস্টকার্ডের ছবির মত। সাড়ে চোদ্দহাজার ফিটের ম্যাটরহর্ন আমাদের ঊনত্রিশ হাজার ফিটের এভারেস্টের কাছে হয়ত চুনোপুটি - কিন্তু আল্পস্-এর উঁচু চূড়োগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর খুবই ছবির মত। আজ আমাদের যাত্রা যেরম্যাট থেকে আর একটা কগ্ হুইল ট্রেনে আরও হাজার পাঁচ ফিট ওপরে গোরনারগ্র্যাট – যেখান থেকে গ্লেসিয়ার দেখা যায়। এই ট্রেনযাত্রায় পথের দৃশ্য দেখে চোখের পাতা ফেলার সময় পাই না। এখন আমরা গ্লেসিয়ার পাড়ায়। গোরনারগ্র্যাট পৌঁছে সত্যিই মনে হল পৃথিবীর চূড়োতে এসে গেছি। প্রায় স্বর্গের কাছাকাছি। সামনেই বিরাট গ্লেসিয়ার। চারদিকে বরফে ঢাকা সাদা পাহাড়। মাথার ওপরে উদার নীল আকাশ।

ঘন্টাতিনেক এখানে কিভাবে কখন কেটে গেলো জানি না। ফিরতে তো হবেই - মনে হল ট্রেনে হুশ করে নেমে না গিয়ে খানিকটা পায়ে হেঁটে নামি। পথে পরের কোনও স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে নেবো।

অতএব আবার আল্পস্-এর কোলে আমাদের হাঁটার শুরু। কালকের দৃশ্যপট পাল্টে গেছে আজ। কাল ছিল সবুজ গাছপালার মধ্যে দিয়ে হাঁটা। আজ আমরা ট্রি-লাইনের ওপরে - সাদা রঙের আধিপত্য বেশী। চারদিকে গ্লেসিয়ার - গ্লেসিয়ার গলা জলের লেক। এমনিই একটা ছোট্ট লেক আমাদের পছন্দ হয়ে গেল পথে। বসে পরলাম ধারে। আমার মত পিটপিটে লোকও লেকের জল খাওয়ার লোভ সামলাতে পারলো না। জন মনিষ্যি কেউ কোথাও নেই। আল্পস্, লেকটা আর আমরা। প্রকৃতির সঙ্গে এত কাছাকাছি ব্যক্তিগত সান্নিধ্য আর কবে হয়েছে? এক মেয়ে লেকের জলে চান করতে নেমেও পড়লো - যদিও ঠাণ্ডার চোটে উঠেও পড়লো মিনিটের মধ্যে। মনে মনে ঘোষণা করে দিলাম - এটা 'আমাদের লেক।' এদিকে বাবা আরেক মেয়েকে নিয়ে গেল লেকের পাশের পাহাড়টাতে উঠে রাজ্য জয় করতে। আমি আমার লেক ও চারদিকের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যতে তখন এতই অভিভূত, ওদের জন্যে দুশ্চিন্তা করতেও ভুলে গেলাম। এসব করে পরের স্টেশনে পৌঁছতে লাগালাম তিন ঘন্টা - যেখানে লাগার কথা ঘন্টাখানেক। এই স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে আবার পথে আরেকটা স্টেশনে নেমে পড়লাম।

ট্রেনে করে গোরনারগ্র্যাট যাওয়ার পথে নদীর ওপর রেলের সেতু থেকে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর জলপ্রপাত দেখেছিলাম এই স্টেশনের ঠিক ঢোকার মুখে। এখন সেতুটায় দাঁড়িয়ে ভাল করে জলপ্রপাতটা দেখার ইচ্ছে। সেতুতে হাঁটতে শুরু করে খেয়াল হলো হাঁটার পথটা রেল লাইনের বড্ড কাছে। সন্দেহ হলো - ট্রেন এলে আমাদের থেকে যথেষ্ট দূরত্ব থাকবে তো! কিন্তু সেতুতে হাঁটতে বারণ করাও তো কোথাও দেখলাম না। সেতু পেরিয়ে দেখলাম - বেআইনী ও বিপজ্জনক কাজ করে ফেলেছি। লেখা আছে সেতু পার হওয়া নিষিদ্ধ - সেতুটা শুধু ট্রেনের জন্য। এবার কি করি? ফিরতে তো হবে। স্টেশনটা তো সেতুর অন্যপ্রান্তে। সেতু পার হবার সময়ে যদি ট্রেন চলে আসে! ভাগ্যিশ এটা সুইস ট্রেন - ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে। হিসেব করে দেখলাম আগামী দশমিনিটের মধ্যে কোনও ট্রেন নেই। সকলে দ্রুতপদে চুপচাপ আবার বেআইনীভাবে সেতু পেরিয়ে স্টেশনটাতে ফিরে এলাম। ছোট্ট পাহাড়ী স্টেশন। লোকজন বলতে আর দুটি পর্যটক। তিনটে ছোট ফুটপাথের মত প্ল্যাটফর্মের মধ্যে কোনটাতে দাঁড়াতে হবে বুঝতে না পেরে সকলে ইতস্ততঃ করছি, ওদিকে ট্রেন আসছে। হঠাৎ দেখি ট্রেনটা থেমে গিয়ে সিটি দিচ্ছে। তাকিয়ে দেখি - ট্রেনের চালক হাত নেড়ে দেখাচ্ছে কোন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে হবে। কী যে মজা লাগলো! এত আধুনিক অটোমেটেড ট্রেন সিস্টেম - তারমধ্যে পুরনো চালের সহজ মানবতার স্পর্শ। নিশ্চয়ই আল্পস্-এর প্রভাব।

আল্পস্ আমাদের মন জয় করে ফেলেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে মনে হয় - হিমালয়ের সৌন্দর্য্য নিশ্চই আরও বিরাট মাপের। যদি তাকেও আল্পস্-এর মত এতটাই আয়ত্তের মধ্যে আনা যেত! সুইটজারল্যাণ্ডের বিরাট কৃতিত্ব যে আমার মত না শক্তমক্ত লোকও আজ আল্পস্-এর এতটা কাছাকাছি যেতে পারে সহজভাবে।

মাতৃদর্শন

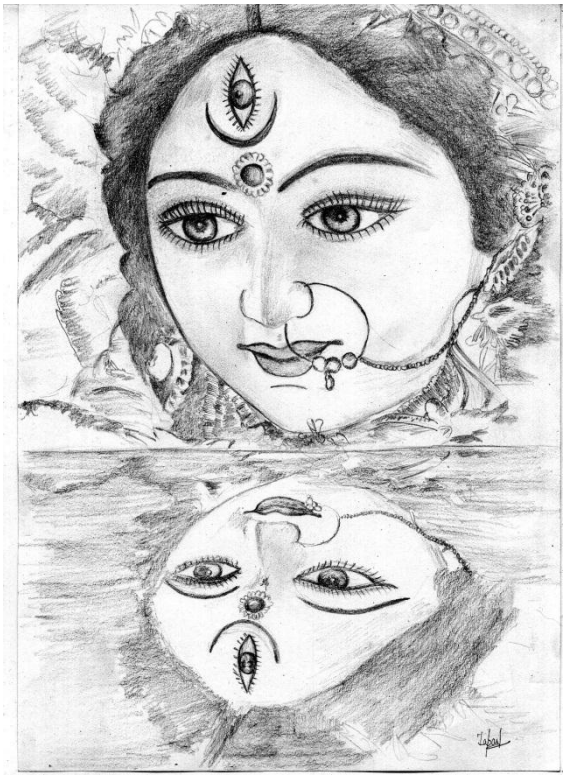

বিরূপাক্ষ পাল

হেমন্তের কোন এক সন্ধ্যায় খেলা ফেলে ঘরে ফিরেছি। হঠাৎ করতালের কিনি কিনি শব্দ। তারপর ভেসে এলো গান - "চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।" দৌড়ে গেলাম পাশের বাড়িতে। আগেই জানতাম - গায়কের নাম গোলকসাধু। বড় চমৎকার গলা তার। পুরো গানটিই তিনি গাইলেন। মা, পাশের বাড়ির ঠাকুমা, আরো কিছু কূলবধু এবং আমরা এক দঙ্গল শিশু গোল হয়ে বসে তার গান শোনলাম।

করতালের ধ্বনির মত শব্দগুলো ছুড়ে দিয়ে শুদ্ধ উচ্চারণে গোলকসাধু গানটা শেষ করলেন। অনেকের চোখে জল দেখেছি। বড় হয়ে বুঝেছি গানটি কেন বাড়ির মহিলাদের মনে দাগ কেটেছিল। স্বাধিনতা উত্তর অভাবী জীবনে কূলবধুরা পুরোনো দিন ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখতো। গানটিতে সেরকম আশ্বাস রয়েছে। গ্রামদেশে কেউ কিছুটা শুদ্ধভাষায় কথা বলতে পারলে লোকে তাকে সর্বজ্ঞ বলে জানে। গোলকসাধু 'কিছুটা' নয় - একেবারে পুরোটা শুদ্ধভাষায় কথা বলেন। এতে রমণীকূল পারলে তার চরণতলে লুটিয়ে পড়ে।

ঐ গানের পর সাধু কিছু কিছু অমূল্য বাণী দান করলেন। সেগুলোর অধিকাংশই ছিল পরকাল সম্পর্কিত। ঐ প্রথম কৈশোরে 'ইহকাল'ই ঠিকমতো বুঝতাম না। তাই পরকালের কথাগুলো ভুলে গেছি। যাক সে কথা। এক পর্যায়ে সাধু "মন খুলে মা'কে ডাকলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়" - এরকম মন্তব্য করলেন। ঠাকুমার দীর্ঘনিশ্বাস - "আমাদের ভাগ্যে কি আর তা হবে? পাপী তাপী মানুষ আমরা!" শাণিত গলায় সাধুর তাৎক্ষণিক জবাব - "আপনি কি এই চর্মচক্ষে জীবন্ত মাদুর্গা দেখতে চান? আমি তা দেখাতে পারি!"

বিশ্ময়ে স্তব্ধ নারীকূল। এর জবাব অবশ্যই 'হ্যাঁ'। কিন্তু এই 'হ্যাঁ' টা বলতেই পূণ্যার্থী নারীরা আবেগে হতবিহ্বল। মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল আগামী অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকারে সাধু আগ্রহীদের মাদুর্গা দর্শন করাবেন। মাদুর্গার কথা কেন আসছে তা বলা দরকার। একেই দুর্গোৎসব বাঙালী হিন্দুর সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। তারপর মাত্র কিছুদিন আগে দুর্গাপূজা শেষ হয়েছে। পূজার রেশ তখনো কাটেনি। সাধু তার বৈষ্ণব ধারায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথা বলতে পারতেন। কিন্তু অভাবী দুর্বল জীবনে শক্তিমাতা ভগবতীর প্রার্থনা প্রবল থাকে। সব মিলিয়ে 'মাদুর্গা দর্শন' এর প্রস্তাবটি ছিল মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পাবার মতো।

কিছুদিন আগে লক্ষ্মীপূজা শেষ হয়েছে। সুস্বাদু নাড়ুমুড়ির সঞ্চয় থেকে কূলবধুরা যেন সব উজাড় করে দেয়। গ্রামে ঘরের বৌ-ঝিয়েরা সাধারণত গৃহকর্তার কথা ছাড়া কোনো দিনক্ষণ ঠিক করে না। আজ তারা মাতৃদর্শনের পূণ্যতিথি পুরুষদের সাথে কোনো আলোচনা না করেই ধার্য করে ফেলেছে। আজ তাদের আপন সিদ্ধান্তে সাধুকে কত কিছু খাওয়াচ্ছে।

এক একটি সন্দেশ আদায় করতে হলে মায়ের সাথে আমাকে যথেষ্ট দড় কষাকষি করতে হতো। সেদিন মা কমপক্ষে দশটি সন্দেশ সাধুকে দিয়ে দেয়ায় আমার হিংসে হচ্ছিল। কিন্তু ঔদার্য দিয়ে তা জয় করেছি। ভাবলাম সাধু এতবড় একটা পূণ্যির সঞ্চয় ঘটিয়ে দেবেন - ক'টা সন্দেশ আর নাড়ু দিয়ে কি তার তুলনা চলে! তাছাড়া এসব কাজে সাধু ইচ্ছে করলে চাঁদা ধার্য করতে পারতেন। তা তিনি করেননি। আমার ভেতরে প্রচন্ড কৌতুহল চেপে গেল। এক ফাঁকে কাকিপিশিদের অলক্ষ্যে সাধুর কাছে গিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন, "অসুবিধা নেই। ছোট বড় সবাই দেখতে পাবে। খোকা, অত রাত অব্দি সজাগ থাকতে হবে কিন্তু!"

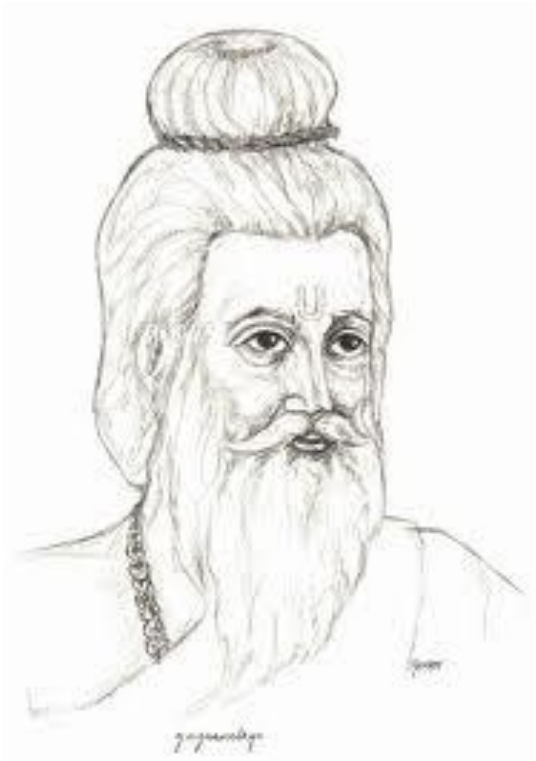

অনুমতি পেলাম বটে, তবে পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে বিশ্ময়কর ঠেকতে লাগলো। বেশ উদ্বেলিত হয়ে পড়লাম। ঐ আদি কৈশোরেই মাতৃদর্শন আমার জন্যে জরুরী ছিল না। তখন পর্যন্ত পাপের পাল্লা ততটা ভারী হয়নি। কী আর পাপ করেছি? কৌটা থেকে গুড় আনতে গিয়ে অনিচ্ছায় দু'একটা পিঁপড়া মেরেছি। লক্ষ্মীর আসন থেকে সামান্য অর্থচুরি করে রূপালী হলে সিনেমা দেখেছি। বাবার পকেট থেকে আধুলি নিয়ে স্কুলে শন্‌পাপরি খেয়েছি। জানামতে এই কয়েকটা অকর্মই আমার জীবনে রয়েছে। এগুলো ছোটখাট চুরির পর্যায়ে পড়ে। ডাকাতি তো করিনি।

মা বলতেন, "অজান ভগবান।" মানে মনের অজান্তে কোনো পাপ করে থাকলে ভগবান তা ক্ষমা করে দেন। লক্ষ্মীপূজার রাতে বিমলা ঠাকুমার গাছ থেকে সদলবলে নারকেল চুরি করেছি। মা নিশ্চিন্ত করেছেন - লক্ষ্মীপূজার রাতে চুরিতে কোনো পাপ নেই। আমার যুক্তি - পাপ হলেও তা চারপাঁচ জনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। এভাবে সব মিলিয়ে আমার পাপের বোঝা সামান্য হলেও পূণ্যের সঞ্চয় বাড়িয়ে রাখতে ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। সে সন্ধ্যায় সাধু ভোজন শেষে তুষ্ট হয়ে বিদায় নিলেন।

রাতে খেতে বসে মা বাবার কানে কথাটা তুললেন। বাবা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। সে যাত্রা কোনো মন্তব্য করলেন না। বাবার মধ্যে আগ্রহের অভাব দেখে আমি বরং বিরক্তই হলাম। দেবীদর্শন কি চাট্টিখানি কথা। কুরুক্ষেত্রে অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দেখেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন। অথচ গোলকসাধু সেরকম একটা ব্যাপার সম্ভব করাবেন শুধু চর্মচক্ষু দিয়েই। তখন ধর্মবইয়ে কেবল পড়েছি ভগবান নারায়ণ দর্শনের উদ্দেশ্যে শিশু ধ্রুব-এর কঠোর সাধনার কথা। সাধনা করতে আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু না খেয়ে ধ্যান করা আমার পছন্দ নয়, ওটা আমার ধাতেও সয় না। ধ্রুব-এর মতো কষ্ট না করেই আমি যদি মহামায়া দর্শন করতে পারি - সেতো পরম পাওয়া। এমন সুযোগ হেলায় হারাবো কেনো? এসব ভেবে ব্যাকুল হয়ে অমাবশ্যা রজনীর অপেক্ষা করতে থাকলাম।

তখনো জানতাম না পৃথিবীটা নির্দিষ্ট গতিতে ঘোরে এবং যেকোনো তিথি যথাসময়েই আসে। শুধু মনে হচ্ছিল অমাবশ্যা যেন আর আসেনা। নারীকূলে ঠিক হলো ঐতিহ্যবাহী চন্ডীমন্ডপেই দুর্গাদর্শন করা হবে। সব চুপচাপ থাকবে। কোনো প্রদীপ জ্বলবে না। উপবাসী থাকলে ভাল হয়। গ্রামের গৃহবধুরা ধর্মীয় কারণে এমনিতেই কমবেশী উপবাস করে থাকে।

তাছাড়া অভাবের কারণেও উপবাস থাকা হয়ে যায়। স্বামী-পুত্র-কন্যা খাবার পর যা থাকে খায়। না থাকলে খায়না। তাই সেই পূণ্যরজনীর উপলক্ষ্যে উপবাসী থাকতে কারোরই আপত্তি নেই।

চিকন স্বাস্থ্যের কারনে আমার পক্ষে উপবাস থাকা সম্ভব হলো না। সেদিন বিকেলে প্রহল্লাদ দাদুর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলাম। তিনি আশ্বস্ত করলেন, "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" কিন্তু হায়! অমাবশ্যার সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি শুরু হলো। মরা বৃষ্টি আর গেল না। প্রথমে ভাবলাম ঝড় বৃষ্টির মধ্যে মা দুর্গার আরেক রূপ দেখবো। দিব্য জ্যোতিতে ফুটে উঠবেন তিনি। ভক্তকূল বলবে, "প্রচন্ডা চন্ডীকা-ঐ নমোঃ।" রাত বাড়লো। কিন্তু গোলকসাধু আর এলেন না। পূণ্যব্যর্থ মনে হতাশা নিয়ে সে'রাতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি - বুঝতেও পারিনি।

এরপর নবান্নের আগমনে বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। বাজারে বা গঞ্জে সাধুকে আর দেখিনি। অগত্যা সান্ত্বনা নিয়েছি - নিজের পূণ্যি কষ্ট করে নিজেকেই সঞ্চয় করতে হবে। ভর্ত্তুকি নিয়ে বড় হওয়া যায় না। কিন্তু মনের ভেতর থেকে একটি প্রশ্ন তাড়াতে পারলাম না। কী হয়েছিল গোলকসাধুর? কেনই বা তিনি গায়ে পড়ে সেভাবে মিথ্যে বলতে যাবেন। ক'টা নাড়ু তক্তিই তো আর সব কিছু নয়। যতদূর মনে পড়ে, তিনি খুব দৃঢ়তা ও ভক্তির সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গল্পটি এখানে শেষ হলেই ভাল হতো। কিন্তু একখানি পাদটীকা যোগ করার প্রয়োজন করছি।

শীতের এক সন্ধ্যায় বাজারের দিকে যাচ্ছি। বালুর চর দিয়ে খানিকটা হেঁটে গিয়ে তারপর শীর্ণ ভোগাই নদী পেরুতে হয়। কিছুটা দূরে নদীর বাঁধের ওপর একখানা সরু রাস্তা চলে গেছে। দেখলাম গোলকসাধু তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আমাদের পাড়ার দিকে। বড়দের কথা বাদই দিলাম। আমার কিশোর মনের এক কোণেও ঐ সাধুর প্রতি কিছুটা ক্ষোভ জমা ছিল। দ্রুত রাস্তা পরিবর্তন করে তার সামনে গিয়ে হাজির হলাম।

কিন্তু আশ্চর্য! তাকে ভীত বা লজ্জিত মনে হল না। বরং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী খোকা, কোথায় যাচ্ছ?" জবাব না দিয়ে আমি শুধু প্রশ্ন করলাম, "মাদুর্গা দেখাবেন বলেছিলেন, কই দেখালেন না তো।" সাধুর উত্তর, "সেদিন বৃষ্টিতে আসতে পারিনি। আজ সেজন্যেই যাচ্ছি। কি গো, তুমিও দেখতে চাও?" আমি উদ্বেলিত হয়ে বললাম, "হ্যাঁ, অবশ্যই।" গোলকসাধু "এইতো মাদুর্গা - মাতৃরূপেনঃ সংস্থিতা" বলেই নিজের মাথার ওপর অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। সাধুর ঘাড়ের ওপর বসে রয়েছে সুন্দর করে সাজানো তার শিশুকন্যা।

অংকনঃ ঈষিকা ও আনিকা কুম্ভকার

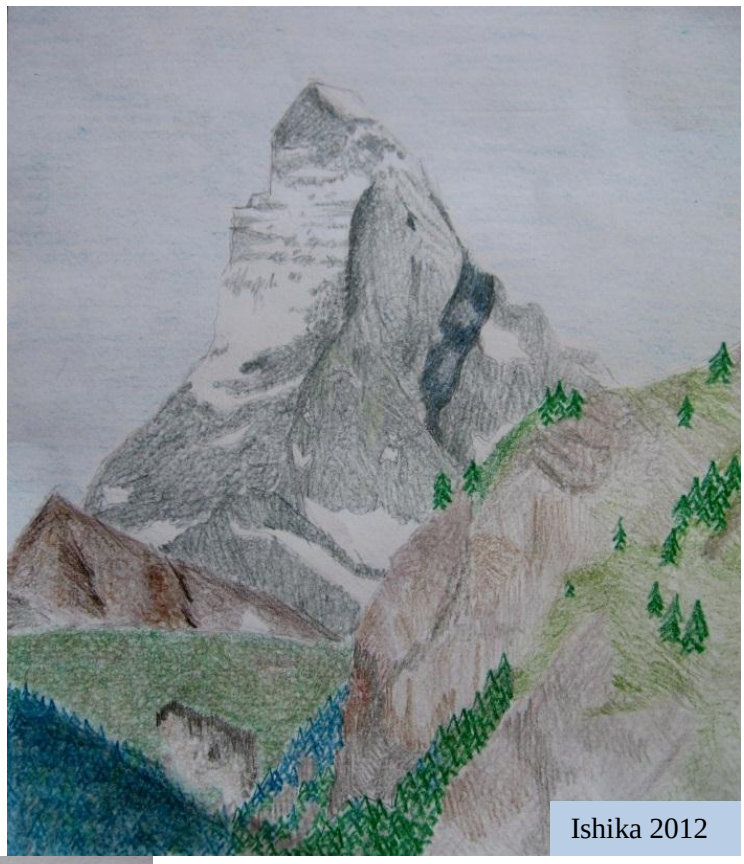

Ishika 2012

Anika 2012

গবেট কোথাকার

গৌতম সরকার

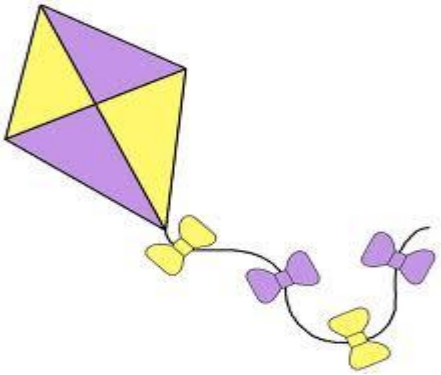

খবরের কাগজে, মানে আনন্দবাজারের ইন্টারনেট সংস্করনে, বিশ্বকর্মা ঠাকুর আর ঘুড়ি-লাটাই এর ছবি দেখে মনটা যেন কেমন করে উঠলো। এই মার্কিন মুলুকে বসেও মনে হল... আচ্ছা, ছাদে উঠে একটু ঐ লাটাইয়ের সুতোয় টান মারলে হতো না?

ছাদ। মানে আমাদের বালিগঞ্জের বাড়ির ছাদ আর কি, মানে যেখানে বড় হয়েছি।

ভোকা---ট্টা। কান ফাটানো চিৎকারে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

- "মানু", তুই কি সারাটা জীবন 'গবেট'-ই থেকে যাবি? লাটাই-টা ধরতে শেখ।

দাদার ধমকানিতে যেন একটু সম্বিত ফিরে পেলাম। দেখি দূরে, উঁচুতে আমাদের ঘুড়িটা কেটে আকাশে ভেসে যাচ্ছে।

- নে, আর ক্যালাকান্তিকের মতো হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে থাকিস না।

আমি তখনো থতোমতো। এটাই যে ছিল আমাদের শেষ ঘুড়ি! বাকিগুলো যে সবই ছেঁড়া-ফাটা।

- কিরে? সুতোটা গোটাবি, নাকি বুবুদাকে ডাকবো লাটাই ধরার জন্য?

আমি ভয়ে প্রানপনে লাটাই ঘোরাতে লাগি। একেতো মাঞ্জা মারার সময় দাদা আমাকে পাত্তাই দেয় না, সবই করে ঐ 'বুবু'দা আর 'ঘোণ্টু'দার সাথে। তার ওপর আমার যদি এই লাটাই ধরার কাজটাও যায়, তাহোলে জীবনে আর থাকলো কি? আর পাশের বাড়ির ঝুম্পু বা 'রূপা'রা যদি এটা জানতে পারে, তাহলে? তাহলে তো প্রেস্টিজে একেবারে আলপিন! আমি প্রানপনে লাটাই ঘোরাতে থাকি। কিন্তু এবার? এবার কি হবে? পকেট গড়ের মাঠ। বাকী ঘুড়ি সব ছেঁড়া। বিকেলটা কাটবে কি করে? গঁদের আঁঠাটা পর্যন্ত গেছে। ছেঁড়া ঘুড়িগুলো যে একটু সাঁটবো তারও উপায় নেই। কি হবে?

- শোন্।

দাদার গলা শুনে একটু আশ্বাস পেলাম।

- নিচে যা। মায়ের কাছ থেকে একটু ভাত ম্যানেজ করে আনতো। ওতেই ছেঁড়া ঘুড়িগুলো সাঁটবো। আর শোন্, একটু খবরের কাগজ ছিঁড়ে আনবি। ভেতরের পাতাটা ছিঁড়বি, বুঝলি? গবেট কোথাকার!

দর দর করে ঘামতে ঘামতে আমি তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম, বোতাম ছেঁড়া হাপ-প্যান্টটা কোনোরকমে সামলে; যাতে খুলে পোরে না যায়। যে করেই হোক, লাটাই ধরার কাজটা আমার বজায় রাখতেই হবে।

"বাজলো তোমার আলোর বেনু।" ঐ তো, রেডিওতে মহালয়া শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আমি উঠবো না। আমার এভাবেই শুয়ে থাকতে খুব ভালো লাগছে। মা-কে পাশ-বালিশ করে এভাবেই আমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। মা-র গায়ের উত্তাপ, আর মা-র গায়ের গন্ধ, দুটোই আমার খুব ভালো লাগছে। মায়ের শাড়ীতে, আঁচলে, যখন মুখ মুছি; আমি তখন ঠিক এই গন্ধটাই পাই। আচ্ছা, এটা কি রসবরার গন্ধ? নাকি কাল বিকেলে যে ডালপুরি করেছিল, তার? নাঃ, এটা বোধহয় সবকিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া এক গন্ধ, আমার মায়ের গন্ধ। আমার ভালো লাগছে।

"ওহো আমার আগোমোনী।" মহালয়া কি শেষ হোতে চললো? আজ বাবা আসবে। ঐ যে, উলুবেড়িয়া না দুর্গাপুর; কোথা থেকে যেন। নাকি আসানসোল? ঐ বোটানিক্যাল গার্ডেনের পাশের কলেজটায়, ঐ যে শিবপুর না কোথায় যেন; ওখানে

যারা পড়াশোনা করে, তাদের নাকি ঐ দুর্গাপুর না আসানসোল; কোথায় যেন যেতে হয়। তাই নাকি 'বাবা'কেও ওদিকেই থাকতে হয় সারা সপ্তাহ। মার খুব দুঃখ তাতে। মা সারা সপ্তাহ তাকিয়ে থাকে এই দিনটার দিকে, বাবা কবে আসবে। সেদিন মাকে অন্য রকম দেখায়। সেদিন মা ভালো ভালো খাবার বানায়। আচ্ছা, মা কি আজ মালপোয়া বানাবে?

- মা, ও মা; আজ কি তুমি...
- আঃ, "বাতা"; সরে শো, একটু সরে শো। আট্টু হলেই তো খাট থেকে পরে যাচ্ছিলি বাবা।
- আচ্ছা মা, বাবা এলে আজ আমরা কি কি করবো?
- প্রথমেই ওঁকে প্রনাম করে নেবে। তোমাদেরও ওঁর মতো লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হতে হবে কিনা!
- তা মা, বাবা কিন্তু লেখাপড়ার নামে অনেক ছবি আঁকে।
- ছবি আঁকে?
- হ্যাঁ মা, কি সব হাতির শুঁড়ের মতো। একবার জিজ্ঞেসও করেছিলাম। তা বাবা বললো ঐ দিয়ে নাকি অঙ্ক কষা যায়। সত্যি?
- সত্যি বৈ কি? তোদের বাবা কোনো কথা মিছি মিছি বলে না।

কিরিং, কিরিং। ঝন্ ঝন্ কোরে বেজে উঠলো কলিং বেলটা। ঐ যে বাবা এসে গেছে। এবারে আর খাট ছেরে উঠতে খারাপ লাগলো না। প্রনাম করতেই,

- থাক, থাক, হয়েছে। ট্রেনের ধুলো-বালি মেখে এলাম..., কিরে গানটা তুলেছিস তো?
- কোন গানটা বাবা?
- এই তো? আবার ভুলে মেরেছিস? ঠিক আছে, দাঁড়া। আমি হাতমুখটা একটু ধুয়ে নিই...

তার পরেই, বাবার গলায় কবিগুরুর সেই সুর।
"তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।" মুহূর্তে সময় যেন দিশা হারালো।
ক্যাঁক-ক্যাঁক, ক্যাঁক-ক্যাঁক, ক্যাঁক-ক্যাঁক.....

- আচ্ছা বাবা, হারমোনিয়ামটা এরকম বিদঘুটে আওয়াজ করছে কেন?
- কই, না তো, ঠিকই আছে। নে ধর... "মনোহরণ চপলচরণ সোনার..."
- হ্যাঁ বাবা, ভাল করে শুনে দেখো...

ক্যাঁক-ক্যাঁক, ক্যাঁক-ক্যাঁক, ক্যাঁক-ক্যাঁক.....

- "বাবা, বাবা! ওয়েইক আপ। ইয়োর অ্যালার্ম ইজ গোইং অফ।"
- ওকে, থ্যাংক্স, গ্রেইসী মা।

ক্যাঁক-ক্যাঁক, ক্যাঁক-ক্যাঁক, ক্যাঁক-ক্যাঁক..... বিছানায় বসে আছি। আজ আর অ্যালার্মটা বন্ধ করতে মন সরছে না। যদি সময়টা ধরে রাখা যায়!

- লেটস্ গেট মুভিং বাবা। আই'ম ডান উইথ মাই শাওয়ার। ইট্স ইওর টার্ন। হোয়াই আর ইউ বীইং স্লো দিস মোরনিং?
- ঈয়েস গ্রেইসী মা, আই'ম জাস্ট...। আই ওয়াজ জাস্ট...।
- ওকে! লেট্স গো। আদারওয়াইজ উই উইল বি লেট ফর স্কুল।

সত্যিই তো, আমারই ভুল। সময় কি কখনো ধরে রাখা যায়? সময় কি কখনো দিক ভোলে? গবেট কোথাকার।

চোখ কোচলে পাশের ঘরে গিয়ে দেখি আমার মায়া মা আর কেইটী মা তখনো ঘুমিয়ে চলেছে অঘোরে। আচ্ছা, ওদের যদি আজ না তুলি? আজ যদি... আজ যদি কাজে না যাই? আজ যদি মালপোয়া করে খাই? তাও কি হয়? এ যে মার্কিন মুলুক। আজ মহালয়া তো কি? গবেট কোথাকার।

Illustrated by Gracelyn (Gracie) Sarkar

বিংহ্যামটনের গল্প

পারভীন পাল

মেঘের কোলে সবুজ পাহাড় ঘেরা ছোট্ট যে শহরটির স্মৃতিকথা লিখতে বসেছি, তার নাম বিংহ্যামটন। প্রায় বছর দশেক আগে নিউইয়র্কের এই ছোট্ট শহরটিতে সপরিবারে আগমন। ছাত্র পরিবার হিসেবে সদ্য অস্ট্রেলিয়া থেকে আমেরিকায় এসেছি। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ ; আবার নতুন করে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে জীবন শুরু করতে হবে এই তাগাদা। সারাদিন কাজের মাঝে অস্ট্রেলিয়ার জমজমাট জীবনের স্মৃতিগুলো থেকে থেকেই মনের কোনে উঁকি ঝুকি দিত। ভাবতাম, আহা কতো ভালোই না ছিলাম সেখানে সাতটা বছর ! কত বাঙালী কত আচার অনুষ্ঠান। একটু বেরুলেই প্রসান্তমহাসাগরের সমুদ্র সৈকত। কি দারুণ আবহাওয়া! সারাটা বছরই যেন একটা উৎসব উৎসব ভাব।

তাই নির্জন এই শহরটিতে হঠাৎ করেই যেন আমি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। অনেক কৌতুহলই তখন মনের ভেতর উদয় হতো। আসে পাশে কোন বাঙালী আছে কিনা, কোন আচার অনুষ্ঠান হয় কিনা, বাঙালীদের জীবনযাত্রা এখানে কেমন। তারা কিভাবে যাতায়াত করে, ট্রেনে, বাসে নাকি গাড়ীতে। ক'দিনেই হতাশ হলাম, কাছাকাছি কোন বাঙালী তো দূরে থাক, কথা বলার মত দুয়েকটা পরিবারও খুঁজে পেলামনা। কিন্তু মনকে মানিয়ে তো নিতেই হবে, তাই ধীরে ধীরে বিংহ্যামটনে ভাল লাগার উপকরণগুলো খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।

প্রথমেই যেটা ভাল লাগতে শুরু করলো, সেটা হলো – বিংহ্যামটনের, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। বাড়ীর আঙ্গিনায় সকাল সন্ধ্যা হরিণ, খরগোস আর কাঠবিড়ালীর আনাগোনা, ভাবাই যায় না, যেন রূপকথার দেশ। মনে পড়ল, এত বছর অস্ট্রেলিয়ায় থেকেও ক্যাঙ্গারুর দর্শন মেলেনি।

শুনেছি শীতের দেশ, বরফের দেশ উত্তর আমেরিকা, কিন্তু তুষার তো কখনো দেখিনি, তাই সেই দৃশ্য দেখার জন্য অনেক কৌতুহলই মনে জমা ছিল। শীতের প্রথমদিকে তুষারপাত দেখবার জন্য আমরা সবাই উন্মুখ হয়ে থাকতাম, কি যে ভাল লাগত, বেশ উপভোগ করতে লাগলাম।

প্রাকৃতিক দৃশ্য, আর বনের পশুপাখী দেখেই আমার দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। কর্তা সকালে বাসে চেপে সারাদিনের জন্যই চলে যেত ইউনিভার্সিটিতে, ছেলে-মেয়ে দুটো স্কুলে। ঘরে আটকে থাকতে মন চাইত না। তা ছাড়া, সংসারের কেনাকাটাও তো কিছু থাকে, কি করা ? নাম্বার ৪৭ বলে একটা বাস রুট ছিল, সেটিই আমার একমাত্র পরিবহণ হয়ে উঠলো। একটি ডলার দিয়ে বাসে চড়ে সারা বিংহ্যামটন বেড়াতাম, আমার জীবনযাত্রায় আবার যেন একটু গতি আসতে শুরু করল।

তারপরও কিসের যেন একটা অভাব মনকে ক্ষণে ক্ষণেই নাড়া দিতো, সেটা হলো বাঙালীর সামাজিক জীবন। প্রায়ই মনে পড়ত,অস্ট্রেলিয়ায় কত বাঙালী কত আচার অনুষ্ঠান, কোনটা ছেড়ে কোনটায় যাই দিশেহারা অবস্থা আরকি। প্রাইভেট কার, ট্রেন, বাস সব যানবাহনেই বাঙালীর সচ্ছল যাতায়াত। প্রাইভেট কার সবার থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। গাড়ী নেই সেতো আরো ভালো কথা, ট্রেনে চেপে বস। যেকোন উপশহরেই ট্রেন স্টেশন মিনিট পনেরো - কুড়ি হাটার দূরত্বের মধ্যেই। ট্রেনে আরও দুয়েকটা বাঙালীর সাথে দেখা হলে গল্প করতে করতে পৌঁছে যাও গন্তব্যে।

শীতের দেশ নিউইয়র্কে ধীরে ধীরে যখন অভ্যস্ত হয়ে উঠছি, তখন একদিন কর্তার মুখে শুনলাম, বিংহ্যামটনেই এক সংবেদনশীল বাঙালী পরিবার আছেন, বহু বছর ধরে আছেন,যারা এই এলাকায় নতুন কোন বাঙালী ছাত্র- ছাত্রী এলে তাদের খোঁজখবর করে থাকেন। তারা হলেন অরিন্দম পুরকায়স্থ এবং দীপাদি। তাদের একদিন নিমন্ত্রণ করলাম – বিংহ্যামটনে ঐ প্রথম বাঙালী দর্শন। বড় ভাল লাগল, শুনলাম বিংহ্যামটনেও নাকি একটা ছোট্ট বাঙালী সমাজ আছে। দীপাদি বললেন, তোমাদের কাছাকাছি আছে – সুবল আর দময়ন্তী, দুজনেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়, মারুফ আর টুম্পা বলে একটি বাংলাদেশী দম্পতি আছে। কোন প্রয়োজন হলে ওদের ফোন কোর, ওরা সাহায্য করবে।

জানলাম, এখানে অনেক বছর ধরে একটা বাংলা নববর্ষ, সরস্বতী পূজা এবং একটা দুর্গাপূজা পুনর্মিলনী হয়। অরিন্দমদা বললেন, তোমরাও এসো ভাল লাগবে। কিন্তু কিভাবে সেই কুড়ি মাইল দূর উইন্ডসর শহরে যাওয়া ? গাড়ী তো নেই? দীপাদি বললেন, সেটা নিয়ে ভেবো না, সুমিত-সুদেষ্ণা বলে আরেকটি বাঙালী দম্পতি আছে, একনিষ্ঠ কর্মী দুজন, সবার সাথে ওরাই যোগাযোগ করে - ওদের বলে দেব, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এভাবেই পরিচয় হয়ে গেল বিংহ্যামটনের বাঙালী সমাজের সাথে। অনেকেই নিমন্ত্রণ করতে আরম্ভ করল, গাড়ী পাঠিয়ে দিত, আমরা সপরিবারে তৈরি হয়ে থাকতাম। প্রথম নিমন্ত্রণটি পেয়েছিলাম, মারুফ-টুম্পার মেয়ের জন্মদিনে।'চাক-ই-চীজ' বলে বাচ্চাদের একটা প্রিয় গেইম সেন্টার আছে, সেখানে। মনে পড়ে আমার ছেলে-মেয়ে দুটো খুব আনন্দ করেছিল। ওদের বাড়ীতেও

একবার ডেকেছিলো, বেশ কয়েক ঘর বাঙালীর সাথে পরিচয় হয়েছিল সেখানে, যেমন – সুফিয়া ভাবী, মিটি ভাবী, এদের সাথে এখনও দেখা- সাক্ষাৎ হয়।

এরপর, নিয়মিতভাবে আমাদের নিমন্ত্রণ আসতে লাগলো , বাংলা নববর্ষ, সরস্বতী পূজা এবং দুর্গাপূজা পুনর্মিলনীতে, হঠাৎ কখনো একটা- দুটো বিয়ের নিমন্ত্রণও মিলে যেত ছাত্রজীবনে । যাইহোক,বছরে এ তিনটে বাধা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকতাম।

কোন্ শাড়ীটা পড়ব, বাচ্চারা কোন্ জামা-কাপড় পড়বে, কর্তার পাঞ্জাবীটার ভাজ ঠিক আছে কিনা ইত্যাদি। তাছাড়া কিছু একটা তো রান্না করে নিয়ে যেতে হত, তারও একটা প্রস্তুতি ছিল। সবমিলিয়ে ক'দিন ধরেই একটা ব্যস্ততা চলত। মনের ভেতর একটা উৎসব উৎসব ভাব জাগত। আত্মীয়-স্বজনহীন এই প্রবাস জীবনে কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকার সুযোগটাও যেন একটা দুর্লভ ব্যাপার মনে হত।

এই বাধা অনুষ্ঠান গুলোতে উপস্থিত হবার জন্য প্রস্তুতির পাশা পাশি আরেকটি শব্দ বিশেষভাবে জড়িত ছিল সেটা হল 'প্রতীক্ষা।' ঐ প্রতীক্ষার কিছু স্মৃতি বেশ আনন্দদায়ক, কিছু হতাশাজনক, কিছু স্মৃতি এখনো মাঝে মঝেই হাসির খোরাক দেয় এবং কিছু শুধুই কথোপোকথন।

সবগুলো তো লেখা তো সম্ভব নয়, তাছাড়া কারই বা ধৈর্য্য আছে এত পড়ার। তাই কিছু লিখছি। সাধারণতঃ, সুমিত আর সুদেষ্ণাই আমাদের জন্য কাছাকাছি থাকা কোন পরিবারের সাথে গাড়ীর ব্যবস্থা করে দিত।

হয়তো রাজাদা - শান্তাদিই হবেন প্রথম পরিবার, যাদের সাথে সরস্বতী পূজায় উইন্ডসর শহরে গিয়েছিলাম। সময় মেনে চলেন তারা, ঠিক সময়ে তৈরি হয়ে থাকতে হত, বেরোবার আগেই একটা ফোন দিতেন যেন দেরী না হয়। শান্তাদি কেরালার, পথে বাংলাতেই গল্প হতো আমাদের। শান্তাদি বাংলা না বলতে পারলেও বুঝতেন। তার কারণ, আমাদের কথায় মাঝে মাঝেই হাসতেন।

আরেকবার কোন এক পরিবারের উপর দায়িত্ব পড়ল আমাদের সরস্বতী পূজায় সঙ্গে নিয়ে যাবার। সকাল সাড়ে দশটায় পূজা শুরু হয়। আমরা যথারীতি তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছি সকাল থেকে। একবার ফোন বেজে উঠল - শোনো, আরেকজনকেও তুলতে হবে তো তাই একটু দেরী হবে। যথার্থ। সকাল পেরিয়ে দুপুর হয়ে গেল - আবার ফোন, দুঃখিত আমাদের আর একটু দেরী হচ্ছে। প্রতীক্ষায় সেদিনে কনকনে শীতেও ঘর আর বাহির করতে করতে আমাদের ঘাম ছুটে গিয়েছিলো।

সিদ্ধার্থ এবং পলা বলে এক দম্পতি ছিল। পলা আমেরিকান, পূজায় আসত এবং সব আচারাদি করতো। একবার সিদ্ধার্থদা আমাদের তুলতে এলেন, ফেব্রুয়ারীর তুষারপাতের দিনে। জানালা দিয়ে চাতক পাখীর মত তাকিয়ে আছি আমরা চারজন। এই বুঝি আমাদের নিতে এলো কেউ। দেখি বেঢপ আকৃতির একটা পুরনো আমলের ভ্যান-গাড়ী আমাদের বাড়ীর সামনে চক্কর দিচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল করলাম ড্রাইভারের গায়ে পাঞ্জাবী। বলে উঠলাম- এইতো, এইতো এসে গেছে আমাদের গাড়ী। জানা গেল, ঐ অদ্ভূত গাড়ীটা সিদ্ধার্থদা তার স্বশুর মানে, পলার বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন। বরফাবৃত রাস্তায় ঐ গাড়ী চালানো বেশ অসুবিধাজনক। তা সত্বেও সেবার ঠিক সময়েই পৌঁছেছিলাম গন্তব্যে।

আমাদের আমেরিকায় প্রবাস জীবনের প্রথম পাঁচটি বছর কেটেছে ঐ বিংহ্যামটনে, নানা আশা-নিরাশায়। স্বামীর চাকুরীর সুবাদে সরে এলাম ৫০ মাইল উত্তরে, আরেকটি শহরে - তার নাম কোর্টল্যান্ড। দেখতে দেখতে এখানেও পাঁচটি বছর গড়িয়ে গেলো। তারপরও বহুস্মৃতিবিজরিত বিংহ্যামটন শহরটি আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে- আর আমরা ছুটে ছুটে যাই। ❄❄❄❄❄

Thoughts on Hanoi: A One Month Retrospective

Raaka Kumbhakar

Author's Note: I have been living in Hanoi, Vietnam for the past month, and will be here until the very end of June 2013. Unwilling to go back to living in the library for four more years immediately after four years of college, I have deferred medical school for one year to accept a Fulbright grant to do research at the Hanoi School of Public Health. My formal project deals with correlating historical infectious disease data with climatologic/ecological factors, with the hope that the modeled results can incite some policy change. My informal project deals with eating as much street food as possible, haggling badly in very poor Vietnamese for both shoes and vegetables, and trying to explore as much of the city as possible on my new and beloved bicycle.

I thought I knew traffic after living part of my life in big cities. But I was wrong. I have not known traffic until now. When walking the half-mile back to my shared house from my office at the Hanoi School of Public Health, I often find myself, on foot, part of the bumper to bumper (or, more accurately, motorbike to motorbike) melee. Though cars are becoming more prevalent than before, this is a city of motorcycles - hurtling recklessly everywhere, on the sidewalk, the wrong way down one way streets, stopping suddenly, darting out with no warning from alleyways. (Their carriage is even more absurd. So far, I have seen motorbikes carrying full families, a refrigerator, a tree, cages of roosters, and a second passenger carrying ten feet long wood or pipe.) No matter how clean and fresh smelling I am when I leave from either direction, within few minutes I am a sweaty, dirty, exhaust soaked mess. Now, on a bicycle, I am the lowest on the traffic food chain, my little bell useless against the constant blaring of car and motorbike horns. And so far my most prized trophy of Hanoi life is the four-inch burn scar across my calf from a motorcycle exhaust pipe which I call: the Hanoi tattoo – the proof of my rocky inductance to this city.

Perhaps this description makes my time here sound rather unpleasant. That's not the case at all, but neither is it an exotic year long jungle sabbatical during which I plan to find myself, *Eat, Pray, Love* style. I am, after all, in a city of a population of seven million, a quickly developing metropolis – but with the vestiges of village life at the ground level, shadowed by the construction of new skyscrapers. A side street that I have passed every day so far is suddenly unrecognizable due to new construction. The shiny new car and motorcycle dealerships that have replaced secondhand bicycle shops are fronted by tiny old carts selling snacks and tea. I live across from an enormous modern convention center- meanwhile I often have to slosh through my flooded alleyway to get to the rusted gate of my house.

American and Korean culture pervade the minds of the young here. This is not somewhere one comes to escape Western influence. Though Uncle Ho still reigns supreme, the Manifest Destiny of Western commercialism has not been halted here either. The Vietnamese I've met have been insistent on guiding me to the best restaurants by Western definition, have told me to take taxis, have told me the modern malls where I can shop. They cannot grasp why somebody raised in a sterilized suburbia in US, would want to have a thick, painfully strong Vietnamese iced coffee spiked with just a bit of condensed milk (*ca phe sua da)* while sitting by the side of a neighborhood "lake" (toxic pond) rather than in an air conditioned, wireless-ready coffee shop. Or why I, like them, somehow enjoy sweating buckets while eating a huge bowl of boiling hot spicy *pho* while squatting on a plastic stool outside of a storefront in 95 degree weather. One

of the best images I have burned into my mind of this is me sitting on one of those stools with two friends, eating the popular *banh minh* sandwich (a veritable textural and taste masterpiece of an airy French roll stuffed with crisp pickled vegetables, cucumber, grilled pork, pate, and chili sauce for about $1.50) in front of a KFC, from which small Vietnamese children stared down at us while eating our version of fast food.

I am not really prone to quixotic flights of fancy regarding second world life. Kolkata is truly an analogous city in this scenario, and I hope that my descriptions of Hanoi reflect personal views of that city. Hanoi is not a magical shining jewel waiting to be discovered, no matter what travel writers will have us think. It is dirty, muggy, hot, and crowded. I don't think I've stopped sweating since I've arrived. The language barrier is maddening and isolating. My first day in my new house, my roommates and I bonded by carrying out a mass cockroach assassination (55 at the last count). I get woken up every day at five o' clock by a rooster who lives next door. Every bicycle ride is both exhilarating and terrifying. But isn't it things like this that make life count? I have a schedule- I go to bed at the same time, I wake up at the same time, I go to work and do the same things every day. But I'm not bored and even nine months from now I don't think I will be. Every day is a challenge, and consequently, the smallest victory is enough to shape my day. The first time I successfully withdrew money from the ATM here, the first time a market lady allowed me to drop her asking price for vegetables (no doubt still overcharging me), learning to drive a motorcycle for the first time in my life, not dying every time I get onto my bicycle, finally being able to unlock the house gate and door on the first try…. And I still have a language to fight my way through, plenty of challenges dealing with research, a city to explore, and friends to make. Being able to define my success in measures that are unrelated to work or school has made me come closer to knowing myself and my real capabilities, and well on my way to loving this city.

And though there are challenges here, there's not much pressure. Here, I'm an outsider no matter what. And so though I'm constantly being watched, it's more as a curiosity than out of judgment. So when I meander towards a food stall just because the smoke wafting from it has lured me there and everybody pauses to stare at me, I can just cheerfully mime and point and ask how much and then slurp down my noodles while trying to eat soup with chopsticks, no problem. When people ask where I'm from, they are genuinely friendly and open; despite all what I've heard about the hardened and cold people of Hanoi. Yes, any walk I take is echoed by *xe om* (motorbike taxis, literally "motorbike hug") drivers yelling "Moto! Moto" after me, but I never feel harassed or followed. Hanoi is used to visitors, so though I am an outlier, I am not an attraction, and generally I get ignored, leaving me to observe my hectic environment in peace.

An NGO worker here mentioned to me that in terms of tourism, Hanoi is not an ideal location and can easily leave a visitor disillusioned (though many love it). I agree. This is not a city of destinations- it *is* the destination. Living here, slowly, surely, carving out a spot on the madness, as I do every day on my bicycle, gives an enormous payoff. In both cases, the best way to survive is to follow the current rather than fighting it, at which point I can look around and discover my surroundings rather than fighting them off.

The Angels Next-Door

Nisarga Nilotpal Paul

When we first moved into Cortland 5 years ago, we moved into what I thought to be an elderly neighborhood. With no children my age nearby, I knew that the only person I could play with was my sister. I was apprehensive about meeting my neighbors. Expecting a grumpy old couple who yells at us to get off of their lawn, my sister and I stayed strictly in our own backyard whenever we played soccer. If the ball ever rolled onto their yard, we would sprint over, looking guilty, and sprint back with the ball in our arms.

As time went on, however, we never saw an angry man or woman walking outside to scold us. In fact, one day we saw our neighbors walking towards us with cheerful smiles. My sister and I smiled back and learned that their names were June and Herb. They explained how they had seen us playing soccer, and how they had observed that we weren't the reckless type. "Feel free to use our yard if you want." Herb said. "Just watch the vegetable patch… and try not to kick the ball at the house." June added. We agreed and thanked them profusely. Smiling, they walked slowly back into their house.

With great joy, my sister and I enjoyed running up and down a big field. We came to see that our neighbors were not the grumpy ones we had been expecting. They were the exact opposite. We were amazed at their kindness. When fall came, they would give us a few homegrown vegetables and tomatoes from their patch. June and Herb gave us two sleds, one purple and one blue, for us to ride in the winter.

As college admissions loomed for my sister, I was left to play soccer by myself. Perhaps June and Herb saw my monotonous routine of kicking a ball against a stone wall, so they gave me some things they had had for a long time: a croquet set, a Frisbee, and a basketball. They were joyous each Halloween, when we trick- or-treated at their house first. We felt blessed to have such kind, thoughtful neighbors.

June and Herb were both stronger than we had known. As Herb left his wife to live in a nursing home, June undoubtedly became stressed. When she asked me to help her to move furniture one day, I saw mounds of bills and paperwork on the floors. Surely this was more stress than June could manage? However, even if she was burdened, she never lat that show. June asked about my sister and sympathized with her college admissions anxiety. Never showing a burdened face, June always managed a cheerful "Howdy!" or "How ya doin'?" whenever we met outdoors. She joyously congratulated my sister when she was leaving for college, and then turned to me and said, "Five more years until it's your turn!"

I suppose I had always naively considered June an everlasting presence by our side. I took it for granted that she would be there to congratulate me when I graduate, like she was for my sister, and that she would always greet us on holidays like she had throughout those years. However, wonderful things never last forever, and neighbors are no exception.

June passed away about a year later. I am not sure when I last saw her, but my sister remembers last talking to June in our backyard about her college life. The day June passed away, we were told, she drove herself to the hospital. Even on her last day, June did not want to worry others with her problems. Throughout all of her troubles, through all of her stress, she remained strong.

She never wished to worry others, only to make them happy. As I remember from our first years in Cortland, Herb used to call June his "earth angel". My neighbors have undoubtedly touched many lives in their time; though we'd only known them for a few years, they also touched ours.

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
Devashree Paul
12th grade

Durga Puja: 26 Ashwin 1419: 13 October 2012

08:00 AM-12.30 PM: Puja (Pushpanjali at 12.15 PM)
12:30 - 1.30 PM: Prasad + Lunch
1:30 - 2.00 PM: Dashami Puja + Pushpanjali + Bisharjan
02:00 - 02:30 PM: Sindoor Utsab + Bijoya + Dhak
02:30 - 05:00 PM: Break
05:00 - 5:30 PM: Sandhya Aarti

05:30 - 06:15 PM: Local Program: Matreebandana
6:15 - 07:00 PM: Invited Artist: Kajori Chakravorty

07:00 - 08:15 PM: Dinner
8:30 - 11:00 PM: Invited Artist: Puja Chatterjee

Kajori Chakravorty

Puja Chatterjee